ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

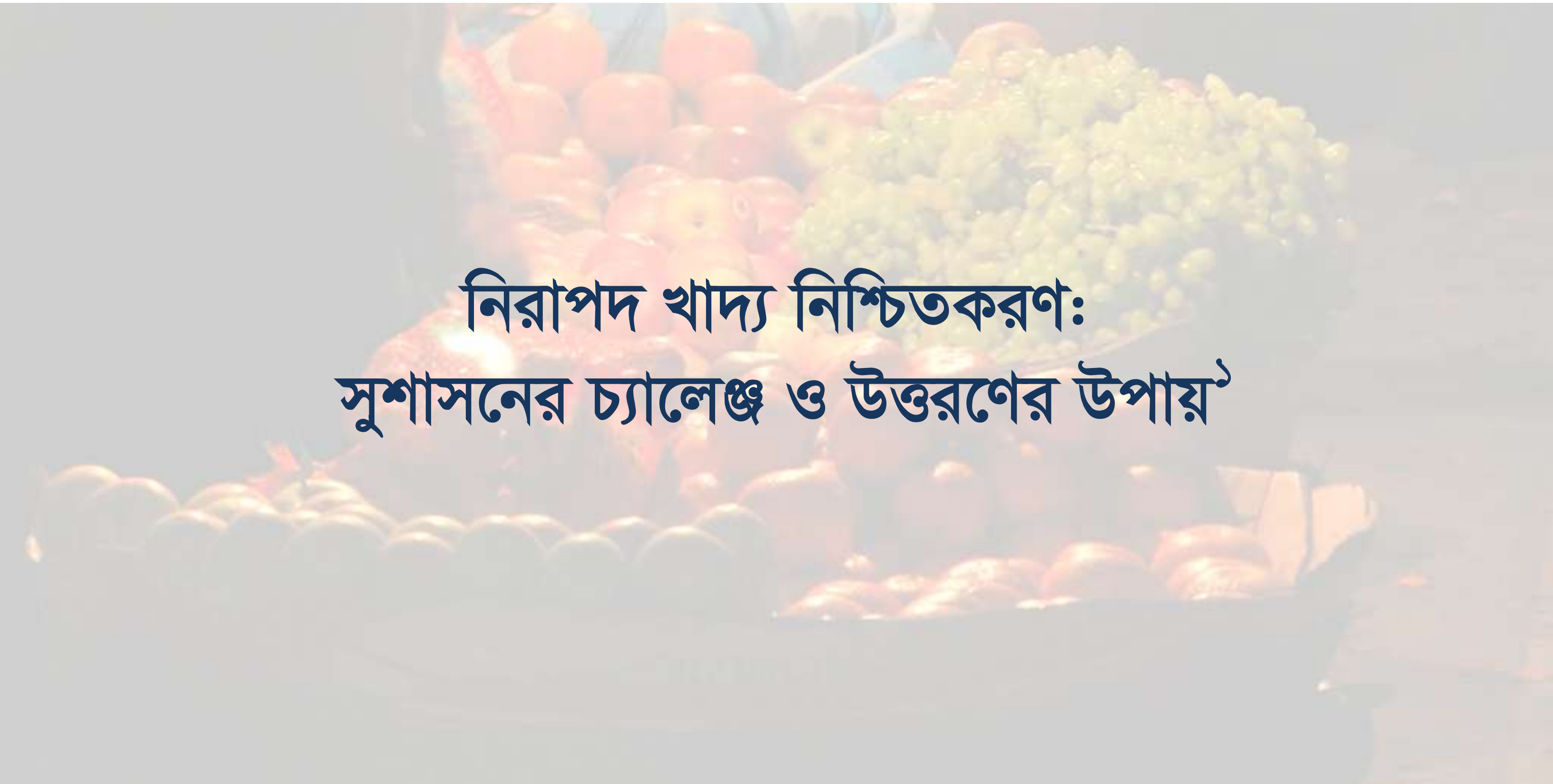

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়[১]

গবেষণা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন

মো. শাহ্নূর রহমান

মার্চ ২০১৪

[১] প্রতিবেদনটি ২০১৪ সালের ২০ মার্চ, হোটেল অবকাশ, মহাখালী, ঢাকায় অনুষ্ঠিত একটি প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

গবেষণা উপদেষ্টা

অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল
চেয়ার, ট্রাস্টি বোর্ড, টিআইবি

এম. হাফিজউদ্দীন খান
সদস্য, ট্রাস্টি বোর্ড, টিআইবি

ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি

ড. সুমাইয়া খায়ের
উপ-নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগ, টিআইবি

গবেষণা তত্ত্বাবধানে

মো. ওয়াহিদ আলম
সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার- রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগ, টিআইবি

গবেষণা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন

মো. শাহ্নূর রহমান
প্রোগ্রাম ম্যানেজার- রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগ, টিআইবি

গবেষণা সহকারি

ছালেহ মুহাম্মদ শাহরিয়ার, গবেষণা সহকারি (খন্ডকালীন)

বিশেষ সহযোগিতায়

সাধন কুমার দাস, শরীফ আহমেদ চৌধুরী, নাজমুল হুদা মিনা

সম্পাদনা ও পরিমার্জনা

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, মো. ওয়াহিদ আলম, সাধন কুমার দাস, মো. রেযাউল করিম

© ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
বাড়ি # ১৪১, সড়ক # ১২, ব্লক # ই, বনানী, ঢাকা ১২১৩
ফোন: ৮৮০-২-৮৮২৬০৩৬, ৯৮৮৭৪৯০
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৮৮৪৮১১
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নম্বর
মুখবন্ধ	
প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা	৫
১.১ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা	৫
১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য	৫
১.৩ গবেষণার পরিধি	৭
১.৪ গবেষণা পদ্ধতি	৭
১.৫ গবেষণার সময়কাল	৭
১.৬ গবেষণার সীমাবদ্ধতা	৭
১.৭ প্রতিবেদন কাঠামো	
দ্বিতীয় অধ্যায়: নিরাপদ খাদ্য তদারকির আইনি কাঠামো	৮
২.১ আইনের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ	৮
২.৩ আইনি কাঠামোতে সীমাবদ্ধতা ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জসমূহ	১০
তৃতীয় অধ্যায়: প্রশাসন ও তদারকি ব্যবস্থা	১৪
৩.১ নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে প্রশাসন ও তদারকি সংশ্লিষ্ট অংশীজনের ভূমিকা	১৫
৩.২ খাদ্য তদারকি ও পরিবীক্ষণে অংশীজনের সীমাবদ্ধতা ও সুশাসনের চ্যালেঞ্জ	১৭
চতুর্থ অধ্যায়: পরীক্ষাগার ব্যবস্থাপনা	২৬
৪.১ পরীক্ষাগার ব্যবস্থাপনায় সীমাবদ্ধতা ও সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ	২৭
পঞ্চম অধ্যায়: উপসংহার ও সুপারিশ	৩০
৫.১ সুপারিশ	৩১
তথ্যসূত্র ও সহায়ক তথ্যপঞ্জি	৩৩
পরিশিষ্ট	৩৪

সারণি ও চিত্রের তালিকা

সারণি ২.১: বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত বর্তমান আইনি কাঠামো	৮
সারণি ২.২ : বাংলাদেশে খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে বিভিন্ন আইনে শাস্তির ধরন	১২
চিত্র ৩.১: নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে প্রশাসন ও তদারকি সংশ্লিষ্ট অংশীজন	১৪
চিত্র ৩.২: স্থানীয় উৎস হতে ঢাকা শহরের ভোক্তা পর্যায়ে মাছের বিতরণ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন পর্যায়ে গড় অবস্থানকাল	২১
চিত্র ৩.৪: আমদানিকৃত খাদ্যপণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও পরিবীক্ষণে অনিয়ম ও সমস্যা	২৪
চিত্র ৫.১ : নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে সুশাসনের ঘাটতির কারণ, ফলাফল ও প্রভাব	৩১

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দেশব্যাপি দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে নাগরিকদের সচেতন ও সোচ্চার করার জন্য কাজ করছে। এর অংশ হিসেবে টিআইবি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণ এবং তা থেকে উত্তরণের জন্য বর্তমান গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ তথা ভেজাল প্রতিরোধে সম্প্রতি নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ প্রণয়নসহ বিগত বছরগুলোতে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে কিছু ইতিবাচক উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে, তা সত্ত্বেও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে কার্যকর ও স্থায়ী অগ্রগতি হয়নি। এই গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায়, প্রায়োগিক পর্যায়ে গৃহীত উদ্যোগগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সাময়িকভাবে গ্রহণ করা হয়, ফলে তা টেকসই হয় না। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে বিদ্যমান আইনের সীমাবদ্ধতা ও কার্যকর প্রয়োগের অভাব রয়েছে। এছাড়া নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে প্রশাসনিক ও তদারকি কার্যক্রমে বেশ কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগ নিয়োজিত থাকলেও এক্ষেত্রে সমন্বিত একক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অনুপস্থিতির কারণে তাদের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় ও যোগাযোগের ঘাটতি রয়েছে। অপরদিকে তদারকি প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতাসহ অভ্যন্তরীন মনিটরিং ও জবাবদিহিতার ঘাটতি লক্ষণীয়। এসকল সীমাবদ্ধতার কারণে খাদ্যপণ্যের তদারকি ও পরিবীক্ষণে অনিয়ম ও দুর্নীতি সংঘটিত হয় যা সাধারণ নাগরিকের স্বাস্থ্য ও জীবনের নিরাপত্তায় ব্যাপক হুমকির সৃষ্টি করছে। এ অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন অর্জনের লক্ষ্যে এ প্রতিবেদনে একগুচ্ছ সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়েছে।

বর্তমান গবেষণা ও প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজটি সম্পন্ন করেছেন টিআইবি'র গবেষক মো. শাহ্নূর রহমান। নিরাপদ খাদ্য তদারকি সংশ্লিষ্ট যেসকল অংশীজন তথ্য উপাত্ত দিয়ে গবেষণা কর্মটিকে সমৃদ্ধ করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এছাড়া টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগসহ বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তারা মতামত দিয়ে প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদের সকলের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

টিআইবি'র ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল এই গবেষণা কর্মটির প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। টিআইবি আশা করে এই প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য, বিশ্লেষণ ও সুপারিশসমূহ বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে বিরাজমান সমস্যা সমাধানে সহায়ক হবে এবং নিরাপদ খাদ্যের প্রশাসন ও তদারকি ব্যবস্থাকে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করে তুলতে সাহায্য করবে এবং ভবিষ্যতে এ ধরণের যে কোনো গবেষণা বা কর্মসূচিতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

এ প্রতিবেদনের পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংশোধনে আপনাদের যে কোনো মূল্যবান পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

প্রথম অধ্যায়
ভূমিকা

১.১ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

বাংলাদেশে জনস্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ খাদ্য[১] নিশ্চিতকরণ একটি বড় চ্যালেঞ্জ। স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রায় প্রতিদিনই খাদ্যে ভেজালের বিভিন্ন ঘটনা সংক্রান্ত (খাদ্যে কেমিক্যাল ও ক্ষতিকারক রাসায়নিকের ব্যবহার, ভেজাল খাদ্য গ্রহণজনিত কারণে মৃত্যু) প্রতিবেদন দেখা যায়। খাদ্যে রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে, খাবার জাতীয় কোনো পণ্যই এখন নিরাপদ নয়। শাকসব্জী, মাছ-মাংস থেকে শুরু করে ফলমূলসহ নিত্যদিনের খাদ্যসামগ্রীতে ভেজাল ও ক্ষতিকারক রাসায়নিকের প্রয়োগ হচ্ছে। ২০১২ সালে দিনাজপুরে লিচু খেয়ে ১৪টি শিশুর মৃত্যুর[২] ঘটনাটি ভেজাল খাদ্যের ভয়াবহতা সম্পর্কে জাতির জন্য একটি উদ্বেগের বিষয়। ভেজাল খাদ্য[৩] গ্রহণের ফলে নানাবিধ দুরারোগ্য ব্যাধি ও জীবনহানির ঘটনা ঘটে। বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার তথ্যমতে, বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ৪৫ লক্ষ লোক খাদ্যে বিষক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়[৪] এবং প্রতিদিন হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা ডাইরিয়ায় আক্রান্ত রোগের অন্যতম কারণ হচ্ছে অনিরাপদ খাদ্য ও পানি।[৫] থাইল্যান্ডের বামরুগ্রাড হাসপাতালের একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মতে, তাদের হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা রোগিদের শতকরা ৫০ ভাগই বাংলাদেশী এবং এ সকল রোগিদের বেশিরভাগই লিভার, কিডনি, প্রজনন সমস্যাসহ অন্যান্য জটিলতায় ভোগে; তার মতে ভেজাল খাদ্যগ্রহণ এসকল অসুস্থতার জন্য দায়ি[৬]। অপরদিকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী বাংলাদেশে যদি ভেজাল খাদ্যের ব্যপকতা কমানো না যায় তাহলে ২০২০ সালের মধ্যে শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রতিবন্ধি শিশুর সংখ্যা আশংকাজনকভাবে বাড়বে।

বক্স-১

"খাদ্যে ভেজাল মেশানো এমন একটি অপরাধ যা খুনের চেয়েও জঘন্য। এক ব্যক্তি একজন বা দু'জনকে খুন করে। আর খাদ্যে যারা ভেজাল মেশায় তারা বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের অনেক মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। এ কারণেই অপরাধ বিশেষজ্ঞরা ভেজালকারীদের খুনীর চেয়েও ভয়ংকর অপরাধী বলে মনে করেন। কারণ এসব ভেজালকারী জাতিকে দিন দিন মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে"

-মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার

জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের পরীক্ষাগারে ২০১০ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত ঢাকাসহ সারা দেশ থেকে মোট ২১,৮৬০টি বিভিন্ন ধরণের খাদ্যপণ্যের নমুনা পরীক্ষায় দেখা যায় শতকরা ৫০ ভাগে ভেজাল রয়েছে[৭]। জনস্বাস্থ্য বিষয়ক সেমিনারের তথ্য অনুযায়ী, ভেজাল খাদ্য গ্রহণের ফলে প্রতিবছর তিন লক্ষ লোক ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় এবং ৫০ হাজার লোক ডায়াবেটিসে ও আরো দুই লক্ষ লোক কিডনিজনিত রোগে আক্রান্ত হয়[৮]। তাই ধারণা করা যেতে পারে ভেজাল খাদ্যজনিত উদ্ভূত স্বাস্থ্য প্রতিক্রিয়া মোকাবেলায় যে বিপুল অর্থ ব্যয় হয়ে থাকে তা জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন সহায়ক কর্মকান্ডে ব্যয় হতে পারত।

---

১ বাংলাদেশের নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ অনুসারে নিরাপদ খাদ্য অর্থ প্রত্যাশিত ব্যবহার ও উপযোগিতা অনুযায়ী মানুষের জন্য বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যসম্মত আহার্য।

২ লিচু খেয়ে মৃত্যু ঘটনায় প্রাথমিকভাবে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা নিপা ভাইরাসকে সন্দেহ করলেও পরবর্তীতে ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় দেখা যায় লিচুতে পেরিথ্রয়িড নামের এক ধরণের সিনথেটিক কীটনাশকের উপস্থিতি রয়েছে। সূত্র: দৈনিক যুগান্তর, ৩০জুন ২০১২।

৩ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা/ খাদ্য ও কৃষি সংস্থার Codex Alimentarius Commission অনুযায়ী একটি খাদ্যপণ্যকে ভেজাল বলে গণ্য করা হয় যদি: এটি স্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ নয় বা ক্ষতিকারক কোনো ধরণের উপাদান মেশানো হয়ে থাকে; ময়লা, দুর্গন্ধযুক্ত বা পঁচে যাওয়ার জন্য অনুপযুক্ত হয়; ইহা প্রস্তুত বা মোড়কজাতকরণ যদি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে হয়ে থাকে যার ফলে এটি দুষিত হতে পারে; যদি এটি নিকৃষ্ট মানের অন্যান্য ক্ষতিকারক উপাদানের সাথে মেশানো হয়; এর উপাদান যদি অন্যকোন অবাঞ্চিত উপাদান দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা হয়; যদি এটি হতে কোন মূল্যবান খাদ্য বা পুষ্টিকর উপাদান বাদ দেওয়া বা সরিয়ে ফেলা হয়।

৪ http://www.fao.org/asiapacific/bangladesh/home/en/ (accessed on 14 november 2012)

৫ http://www.ban.searo.who.int/en/Section3/Section40/Section104.htm (accessed on 14 november 2012)

৬ Saidur Rahman, " Food adulteration poses too serious a threat to public health", The Daily Independent, 24 February, 2014, Op-ed page:7

৭ জনস্বাস্থ্য ইনস্টিউট, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ৩০ জানুয়ারি ২০১৪, ঢাকা।

৮ Mohd Siddiqur Rahman, "Chemically treated food: A Silent Killer", The New Nation, 12 September, 2012, Page:5

বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সরকারের ১০টি[৯] মন্ত্রণালয়ের প্রায় ১২টি[১০] অধিদপ্তর/বিভাগ জড়িত। সম্প্রতি নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ তথা ভেজাল প্রতিরোধে সরকারি ও বেসরকারিভাবে কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে- ২০১০ সালে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এবং বাংলাদেশ সরকারের যৌথ সহযোগিতায় নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে প্রকল্প গ্রহণ ও এ প্রকল্পের আওতায় জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণে একটি স্বতন্ত্র পরীক্ষাগার স্থাপন, ২০১৩ সালে এফবিসিসিআই ও কয়েকটি বেসরকারি ব্যাংকের উদ্যোগে ঢাকাসহ দেশের ১৮টি[১১] বাজার ফরমালিনমুক্ত করার উদ্যোগ ও ফরমালিন সনাক্তের যন্ত্র সরবরাহ, ফরমালিনের অপব্যবহাররোধে ফরমালিন নিয়ন্ত্রণে আইন, ২০১৩ খসড়া প্রণয়ন, জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কর্তৃক খাদ্যে ভেজাল নিয়ন্ত্রণে বাজার পরিদর্শন কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং ২০১৩ সালের ১০ অক্টোবর নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ প্রণয়ন অন্যতম।

খাদ্য মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ক)[১২] অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এ চাহিদাপূরণ রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে স্বীকৃত। এ মৌলিক চাহিদা পূরণে জাতীয় খাদ্য নীতি ২০০৬ এ নিরবিচ্ছিন্নভাবে পর্যাপ্ত নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করা (উদ্দেশ্য-১) ও সকলের জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টি বিধান (উদ্দেশ্য-৩) এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং এ উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের কৌশল হিসেবে উৎপাদন পর্যায় হতে খাবার গ্রহণ পর্যায় পর্যন্ত খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণে ঝুঁকি নিরুপণ ও রোধকরণ পদ্ধতির বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। জীবন ধারণের জন্য খাদ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হওয়া সত্ত্বেও ক্রমাগত খাদ্যপণ্যে ভেজাল জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভেজাল খাবার জনস্বাস্থ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করার পাশাপাশি সার্বিক অর্থনীতির ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। ভেজাল খাবার গ্রহণ করে মানুষ যেসব মারাত্মক অসুখে আক্রান্ত হচ্ছে তার চিকিৎসা ব্যয় অত্যধিক এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দীর্ঘস্থায়ী চিকিৎসা লাগে বা আজীবন চিকিৎসা করতে হয়। এতে জনগণের আয়ের একটি বড় অংশ চলে যায় অনাকাঙ্খিত চিকিৎসা ব্যয়ে। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ তথা খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে সরকারের উপরিল্লিখিত উদ্যোগসমূহ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই সন্তোষজনক নয়, কারণ খাদ্যে ভেজালের বিষয়টি প্রতিবছরই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আসে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সাময়িক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় ফলে এসব উদ্যোগ সত্ত্বেও ভেজাল খাদ্যের ব্যপকতা অব্যাহত থাকে। খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণ করলেও ভেজালকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয় না এবং তদারকি সংশ্লিষ্ট অংশীজনের অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। ভেজাল খাদ্যের ব্যাপকতা, খাদ্যে ক্ষতিকারক রাসায়নিকের ব্যবহার ও স্বাস্থ্যঝুঁকি সম্পর্কে গবেষণা হলেও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে তদারকি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সুশাসনের সমস্যা সম্পর্কে গবেষণার ঘাটতি রয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে তথা খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে সুশাসনের সমস্যা ও উত্তরণের উপায় চিহ্নিত করার জন্য ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এ গবেষণা পরিচালনা করেছে।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে সুশাসনের সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং তা থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রদান করা। এছাড়াও সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে-

- খাদ্যে ভেজাল নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির ক্ষেত্রে বিদ্যমান মৌলিক আইনসমূহ পর্যালোচনা করা ও বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ নিরূপণ করা
- নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি পর্যালোচনা করা

---

৯ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

১০ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মৎস্য বিভাগ, পশু পালন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, কৃষি অধিদপ্তর, বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই), কাস্টমস বিভাগ পুলিশ বিভাগ, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ান, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন পর্যায়ে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।

১১ ঢাকা শহরের ১০টি বাজার হচ্ছে- মালিবাগবাজার, শান্তিনগর বাজার, মহাখালী বাজার, গুলশান বাজার-২, কাপ্তান বাজার, মোহাম্মদপুর বাজার, উত্তরা সমবায় বাজার, বাদামতরী ফলবাজার, মিরপুর শাহ আরী বাজার ও বনানী। ৮টি জেলা শহরের মধ্যে ময়মনসিংহ, মানিকগঞ্জ, রংপুর, লালমনিরহাট, দিনাজপুর, ফরিদপুর, নীলফামারী ও নওঁগা। তথ্য সূত্রঃ এফবিসিসিআই, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪, ঢাকা।

১২ রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায়: (ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা।

১.৩ পরিধি

এ গবেষণায় নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের সুশাসন আলোচনার ক্ষেত্রে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার বিদ্যমান আইনি কাঠামো, প্রশাসন ও তদারকি ব্যবস্থা ও পরীক্ষাগার ব্যবস্থাকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। উল্লিখিত উপাদানগুলো সুশাসনের বিভিন্ন নির্দেশকের (আইনের শাসন, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সেবার মান ও দুর্নীতি) ওপর ভিত্তি করে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মধ্যে মাঠ পর্যায়ে কর্ম পরিধি ও গুরুত্ব বিবেচনায় ৬টি (স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, বিএসটিআই, কাস্টমস হাউজ, মোবাইল কোর্ট) প্রতিষ্ঠান ও ৪টি পরীক্ষাগারকে (পিএইচএল, পিএইচএফএল, বিএসটিআই, কাস্টমস হাউজ) অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

১.৪ গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণাটি গুণবাচক তথ্য বিশ্লেষণ-নির্ভর। গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে সংগৃহীত তথ্য যাচাই-বাছাই ও বিশ্লেষণ করে এই প্রতিবেদনে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি হিসেবে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, দলগত আলোচনা ও পর্যবেক্ষণ ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎসগুলো হল- সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর ও বিভাগগুলোর মহাপরিচালক, পরিচালক, কাস্টমস কর্মকর্তা, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর, ক্যাব প্রতিনিধি, বন্দর প্রতিনিধি, সিএন্ডএফ এজেন্ট, মৎস্য, শাক-সবজি ও ফল ব্যবসায়ী, আড়তদার, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সংবাদকর্মী, খাদ্য ও পুষ্টি গবেষক এবং স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ। পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ ১৯৫৯ (সংশোধনী ২০০৫), ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯, নিরাপদ খাদ্য আইন ২০১৩ এবং ভেজাল খাদ্যে ও খাদ্যদ্রব্যে ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহারের ওপর প্রকাশিত প্রতিবেদন, প্রবন্ধ, সাময়িকী, পুস্তক ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে।

১.৫ গবেষণার সময়কাল

এই গবেষণা কার্যক্রমটি ফেব্রুয়ারি ২০১৩ - মার্চ ২০১৪ সময়ের মধ্যে পরিচালনা করা হয়েছে।

১.৬ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

- নিরাপদ খাদ্যের তদারকি সংশ্লিষ্ট অংশীজনের তথ্য ব্যবস্থাপনার ঘাটতি ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতার অভাবে কোনো কোনো বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি।
- দুর্নীতি সংক্রান্ত ঘটনায় সংশ্লিষ্ট উভয় পক্ষ লাভবান হওয়ায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে আর্থিক লেনদেনের প্রকৃত পরিমাণ জানা সম্ভব হয় নি।

১.৭ প্রতিবেদন কাঠামো

এই প্রতিবেদনে পাঁচটি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা, গবেষণার পরিধি, পদ্ধতি এবং সীমাবদ্ধতা আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে নিরাপদ খাদ্য তদারকিতে আইনি কাঠামো পর্যালোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মৌলিক আইনসমূহের উল্লেখযোগ্যদিক এবং আইনসমূহের সীমাবদ্ধতা ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে প্রশাসনিক ও তদারকি সংশ্লিষ্ট অংশীজনের ভূমিকা, কার্যক্রম পরিচালনায় সীমাবদ্ধতা ও সুশাসনের চ্যালেঞ্জ আলোকপাত করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণে পরীক্ষাগার ব্যবস্থাপনার সীমাবদ্ধতা ও সুশাসনের ঘাটতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে সুশাসনের ঘাটতির কারণ, প্রভাব ও ফলাফল আলোচনার পাশাপাশি নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনাকে আরও উন্নত ও টেকসই করার জন্য সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
নিরাপদ খাদ্য তদারকির আইনি কাঠামো

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ তথা খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে সরকার বিভিন্ন সময়ে বেশ কিছু আইন প্রণয়ন করেছে। এ সকল আইনের ওপর ভিত্তি করে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের যাবতীয় কার্যক্রম এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে। এ গবেষণায় নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত তিনটি আইন- বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ (সংশোধিত ২০০৫), ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ ও নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ পর্যালোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এ বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ রহিত করা হয়। কিন্তু সরকার কর্তৃক গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা আইনটি বলবৎ করার বিধান থাকলেও তা এখনো করা হয়নি। ফলে বর্তমানে বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ (সংশোধিত ২০০৫) বহাল রয়েছে। তাই এ গবেষণায় উল্লিখিত দুটি আইনই আলোচনা করা হয়েছে।

সারণি ২.১: বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত বর্তমান আইনি কাঠামো

১.দণ্ডবিধি, ১৮৬০
২. কন্ট্রোল অব অ্যাসেন্সিয়াল কমোডিটিজ অ্যাক্ট, ১৯৫৬
৩. ফুড (স্পেশ্যাল কোর্টস) অ্যাক্ট, ১৯৫৬
৪. দি পিওর ফুড অর্ডিন্যান্স, ১৯৫৯
৫. ক্যান্টনমেন্ট পিওর ফুড অ্যাক্ট, ১৯৬৬
৬. পেস্টিসাইডস অর্ডিন্যান্স, ১৯৭১
৭. স্পেশ্যাল পাওয়ার অ্যাক্ট, ১৯৭৪
৮. ফিস অ্যান্ড ফিস প্রডাক্টস (ইন্সপেকশন অ্যান্ কন্ট্রোল) অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৩
৯. দি ব্রেস্ট মিল্ক সাব্সটিটিউট(রেগুলেশন অব মার্কেটিং) অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৪
১০. বিএসটিআই অধ্যাদেশ, ১৯৮৫
১১. আয়োডিন ডেফিসিয়েন্সি ডিসঅর্ডারস প্রিভেনশন অ্যাক্ট, ১৯৮৯
১২. ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯
১৩. স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯
১৪. স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯
১৫. মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯
১৬. নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩

আইনের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ

২.১ বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ (সংশোধিত ২০০৫)

খাদ্যে ভেজাল নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে প্রথম ও মৌলিক আইনি পদক্ষেপ হচ্ছে 'বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ, ১৯৫৯'। এই অধ্যাদেশে খাদ্যে ভেজালরোধ ও খাদ্য উৎপাদন-বিপণন নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বেশ কিছু বিধান করা হয়- খাদ্য পরিদর্শক নিয়োগ, খাদ্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান তদারকি ব্যবস্থা, জরিমানা ও দণ্ডের বিধান, প্রতিটি জেলা ও মহানগর এলাকায় খাদ্য আদালত গঠন ইত্যাদি উল্লেখ্যযোগ্য। খাদ্য আদালত গঠনের ক্ষেত্রে সরকার গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে প্রতিটি আদালতের ভৌগোলিক আওতা নির্ধারণ করবে। কিন্তু স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে প্রণীত এ আইনটির বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা ও বর্তমান সময়ের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সময়োপযোগী না হওয়ায় পরিবর্তীত অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০০৫ সালে এ আইনের সংশোধন আনা হয়। সংশোধিত আইনে জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা উপদেষ্টা কাউন্সিল গঠন করা হয়। এছাড়া এ সংশোধনের মাধ্যমে সর্বপ্রথম নির্দিষ্টভাবে খাদ্যসামগ্রীতে ক্ষতিকর রাসায়নিক উপাদান ও ফরমালিনের ব্যবহারকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয় এবং খাদ্যে ভেজাল সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে জরিমানা ও দণ্ডের পরিমাণ বৃদ্ধি করে অনুর্ধ্ব তিন বছরের কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানার বিধান রাখা হয়।

২.২ নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩

নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ ও আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে সরকার ২০১৩ সালের ১০ অক্টোবর এতদসংক্রান্ত বিদ্যমান সকল আইন ও অধ্যাদেশ রহিত করে নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করে। এ আইনে নিরাপদ

খাদ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণে খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ, সরবরাহ, বিপণন কার্যক্রম সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণে একটি কার্যকর কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা সংস্থার আওতায় প্রচলিত খাদ্যে ভেজালরোধ ও নিরাপত্তাসংক্রান্ত সব কার্যক্রম একই ছাতার নিচে আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে আইনের ১(২) ধারায় সরকার কর্তৃক গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা আইনটি বলবৎ করার বিধান থাকলেও এখন পর্যন্ত আইনটি বলবৎ করার জন্য গেজেট প্রকাশ করা হয়নি। এর ফলে মাঠ পর্যায়ে এখনও বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ (সংশোধিত ২০০৫) বহাল রয়েছে। নিম্নে নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ আলোচনা করা হল-

২.২.১ নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত

এ আইনে সর্বপ্রথম নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়নসহ প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে 'জাতীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা পরিষদ'[১৩] এবং 'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ'[১৪] নামক একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা প্রতিষ্ঠার বিধান করা হয়েছে। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণে খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ, মজুদ, সরবরাহ ও বিক্রয় সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও পরিবীক্ষণ এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার কার্যাবলির সমন্বয় সাধন করা হবে। এ সংস্থাটি মূলত নিরাপদ খাদ্যের তদারকি ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রমে নিয়োজিত সকল সংস্থার 'আমব্রেলা বডি' হিসেবে কাজ করবে। এছাড়া নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, সংস্থা ও দীর্ঘ পেশাগত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সমন্বয়ে 'কেন্দ্রীয় নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি' গঠনের বিধান রাখা হয়েছে (ধারা- ১৫)। এ সকল ব্যক্তিদের কারিগরি জ্ঞান ও সহায়তার মাধ্যমে দেশে নিরাপদ খাদ্যব্যবস্থা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে।

২.২.২ সংশ্লিষ্ট অংশীজন, সংস্থা বা ব্যক্তির দায়িত্ব পালনে বাধ্যবাধকতার বিধান

এ আইনে নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত যে কোনো কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা ব্যক্তিকে নিরাপদ খাদ্য ও এর গুণগতমান সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে পারবে এবং তারা উক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যসম্পাদনে বাধ্য থাকবে। আবার নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ যে কোনো সংস্থা বা ব্যক্তির নিকট প্রয়োজনীয় সহায়তা চাইলে তা প্রদানে বাধ্য থাকবে।

২.২.৩ খাদ্য ব্যবসায়ীদের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে আলোকপাত

এ আইন অনুযায়ী, যদি কোনো ব্যবসায়ী মনে করেন, তিনি যেসব খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, সরবরাহ বা বিক্রয় করেছেন, তা আইনানুযায়ী ভোক্তার জন্য অনিরাপদ, তাহলে তিনি এ সকল পণ্য দ্রুত বাজার বা ভোক্তার কাছ থেকে প্রত্যাহার করবেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবেন (ধারা- ৪৩ ও ৪৪)।

২.২.৪ খাদ্যদ্রব্যে ক্ষতিকারক রাসায়নিকের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ

এ আইনানুযায়ী কোনো ব্যক্তি বা তার পক্ষে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানবস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর অথবা বিষক্রিয়া সৃষ্টিকারী রাসায়নিক দ্রব্য যেমন, ক্যালসিয়াম কার্বাইড, ফরমালিন, সোডিয়াম সাইক্লামেট ইত্যাদি খাদ্যোপকরণের ব্যবহার করতে পারবে না এবং এসকল দ্রব্য মিশ্রিত খাদ্যদ্রব্যের মজুদ, বিপণন বা বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে (ধারা- ২৩)।

২.২.৫ ক্যামেরায় গৃহীত ছবি ও রেকর্ডকৃত কথাবার্তা সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণের বিধান

এ আইন অনুযায়ী, নিরাপদ খাদ্যব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত কোনো ব্যক্তি বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কোনো সদস্য বা অন্য কোনো ব্যক্তি এ আইনে বর্ণিত কোনো অপরাধ বা ক্ষতি সংঘটন বা সংঘটনের প্রস্তুতি গ্রহণ বা সংঘটনে সহায়তা সংক্রান্ত কোনো ঘটনার বিষয়ে ভিডিও বা স্থিরচিত্র ধারণ বা গ্রহণ করলে বা কোনো কথাবার্তা বা আলাপ-আলোচনা রেকর্ড করলে ওই ভিডিও, অডিও ও স্থিরচিত্র উক্ত অপরাধ বা ক্ষতিসংশ্লিষ্ট মামলা বিচারের সময় সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে (ধারা- ৭২)।

২.২.৬ বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি ও জরিমানার বিধান

এই আইনে ২৩ ধরনের অপরাধের শাস্তির জন্য বিভিন্ন মেয়াদে লঘু থেকে গুরুদণ্ডের সাজা ও জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। জীবননাশক বা মানবস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কোনো রাসায়নিক বা ভারী ধাতু বা বিষাক্ত দ্রব্যমিশ্রিত কোনো খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন,

[১৩] খাদ্যমন্ত্রী সভাপতি ও মন্ত্রিপরিষদের সচিব সহ-সভাপতি থাকবেন (ধারা- ৩)।

[১৪] একজন চেয়ারম্যান ও চারজন সদস্যের সমন্বয়ে এ কর্তৃপক্ষ গঠিত হবে (ধারা- ৫)।

আমদানি, প্রস্তুত, মজুদ, বিতরণ, বিক্রয় বা বিক্রয়ের অপচেষ্টা করলে অনূর্ধ্ব পাঁচ বছরের কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ১০ লাখ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে। পুনরায় একই অপরাধ করলে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড বা ২০ লাখ টাকা জরিমানা বা উভয়দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে (ধারা- ৫৮)।

২.৩ ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯

ভোক্তা অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ভোক্তা অধিকার বিরোধী কার্যক্রম প্রতিরোধের লক্ষ্যে ২০০৯ সালে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ প্রণয়ন করা হয়। এ আইনটি নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে তথা খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ আইন হিসেবে বিবেচিত। এ আইনে অনিরাপদ বা ভেজাল খাদ্যের বিষয়টি ভোক্তা অধিকার বিরোধী কার্যক্রমের[১৫] মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ আইনের মাধ্যমে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ[১৬] ও 'ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর' গঠন করা হয়েছে। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়নের পাশাপাশি ভোক্তা অধিকার সম্পর্কে গবেষণা ও জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারকে আইনগত ও প্রশাসনিক নির্দেশনা প্রদান করবে। এ লক্ষ্যে পরিষদ প্রতি দুই মাসে একটি সভা করবে। এছাড়া এ আইনে জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটির[১৭] গঠন সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়েছে। এই কমিটি জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করবে এবং স্থানীয় পর্যায়ে নাগরিকদের সচেতন করে তোলার পাশপাশি পণ্য উৎপাদন ও বিপণন প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যাবলী তদারক ও পরিবীক্ষণ করবে। প্রতিমাসে এই কমিটির কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার বিধান রয়েছে। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর প্রয়োজনবোধে প্রতিটি উপজেলায় উপজেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি এবং প্রতিটি ইউনিয়নে ইউনিয়ন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি গঠন করতে পারবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া এ আইনে খাদ্যপণ্যে ভেজাল মিশ্রণ করলে অনূর্ধ্ব তিন বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে।

২.৪ আইনি কাঠামোতে সীমাবদ্ধতা ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জসমূহ

২.৪.১ নিরাপদ খাদ্য আইন,২০১৩ বলবৎ না করা

আইনটি ২০১৩ সালের ১০ অক্টোবর প্রণয়ন করা হয়। আইনের ১(২) ধারায় সরকার কর্তৃক গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা আইনটি বলবৎ করার বিধান থাকলেও এখন পর্যন্ত গেজেট প্রকাশ করা হয় নি।

২.৪.২ ভোক্তা বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির মামলা দায়ের করার বিধান না থাকা ও ভোক্তার অভিযোগ নিরসনে প্রক্রিয়াগত জটিলতা

ভোক্তা কোনো খাবার খেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত বা অসুস্থ হলে বা কোনো খাবারে ভেজাল বলে সন্দেহ হলে বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ ১৯৫৯ [৪১(ক) ধারা][১৮] ও ভোক্তা সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ (৬০ধারা) এ সরাসরি মামলা দায়ের করার বিধান রাখা হয় নি। এক্ষেত্রে ভোক্তা বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তার কাছে আবেদন করতে হবে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সংশ্লিষ্ট অপরাধের বিষয়ে প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত হলে আইনি পদক্ষেপ নিবেন। মামলা করার ক্ষেত্রে এসকল প্রক্রিয়াগত জটিলতার কারণে অনেকসময়ই ভোক্তারা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও অভিযোগ করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

২.৪.৩ নিরাপদ খাদ্য আইনে সরাসরি মামলা করার ক্ষেত্রে ৩০ দিনের বাধ্যবাধকতার বিধান

নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর ৬৬(৩)[১৯] ধারায় সরাসরি মামলা দায়েরের বিধান থাকলেও এক্ষেত্রে ৩০ দিনের বাধ্যবাধকতার বিধান রাখা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় ভেজাল খাদ্য গ্রহণ বা দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক বা

---

১৫ এ আইনের ২০(গ) ধারায় বলা হয়েছে, মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক কোন দ্রব্য যার মিশ্রণ কোন আইন বা বিধির অধীনে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, এরূপ দ্রব্য মিশ্রিত কোন পণ্য বিক্রয় করা বা বিক্রয়ের প্রস্তাব করা ভোক্তা অধিকার বিরোধী কার্য হিসেবে গণ্য হবে।

১৬ ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের ভোক্তা অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট ২৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী চেয়ারম্যান ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ পরিষদের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

১৭ জেলা পর্যায়ে ১২ সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটির সভাপতি হবেন জেলা প্রশাসক এবং জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত তাহার কার্যালয়ে কর্মরত অন্যূন সহকারী কমিশনার পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা, যিনি উহার সচিব হবেন।

১৮ বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ এর ৪১(ক) ধারায় বলা হয়েছে, Notwithstanding anything contained in the code of criminal procedure, 1898(Act No. V of 1898) no court shall take cognizance of any offence punishable under this ordinance except upon a complaint in writing, made by a public analyst or an Inspector or a person authorised by the Government.

১৯ নিরাপদ খাদ্য আইনের ৬৬(৩) ধারায় বলা হয়েছে, এই ধারায় ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যে কোন ব্যক্তি, এই আইনের অধীনে মামলা দায়েরের জন্য কারণ উদ্ভব হইবার ৩০ দিনের মধ্যে, নিরাপদ খাদ্য বিরোধী যেকোন কার্য সম্পর্কে খাদ্য আদালতে মামলা দায়ের করতে পারবেন।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সাধারণত দীর্ঘ মেয়াদে হয়ে থাকে। এরফলে ভোক্তা বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা সম্ভব নাও হতে পারে।

২.৪.৪ প্রতিটি জেলা ও মহানগরে খাদ্য আদালত গঠন না হওয়া

বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশে, ১৯৫৯ [৪১(১)[২০]] এ দেশের প্রতিটি জেলা ও মহানগরে প্রয়োজনীয় সংখ্যক (প্রয়োজনে একের অধিক) খাদ্য আদালত গঠনের বিধান করা হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘ অর্ধ শতকেরও বেশি সময় অতিবাহিত হলেও দেশের প্রতিটি জেলা ও মহানগরে খাদ্য আদালত গঠিত হয় নি। ২০০৯ সালের ১ জুন হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশ বনাম বাংলাদেশ (রিট পিটিশন নং ৩২৪/২০০৯) মামলায় হাইকোর্ট সরকারকে প্রতিটি জেলা ও মহানগরে খাদ্য আদালত স্থাপনের নির্দেশ দেয় এবং রায় কার্যকরের জন্য আদালত সরকারকে দুই বছরের সময়সীমাও বেঁধে দেয়। উল্লেখ্য যে, এখন পর্যন্ত সারা দেশের মধ্যে একমাত্র ঢাকা দক্ষিন সিটি কর্পোরেশন এলাকায় একটিমাত্র খাদ্য আদালত ব্যতিত অন্যান্য জেলা ও মহানগরে খাদ্য আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

২.৪ ৫ নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ তে শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত গঠনের বিধান রাখা

বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ এ সুস্পষ্টভাবে প্রতিটি জেলা ও মহানগরে প্রয়োজনীয় সংখ্যক খাদ্য আদালত গঠনের উল্লেখ থাকলেও নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ [৬৪(১)][২১] তে শুধুমাত্র 'প্রয়োজনীয় সংখ্যক আদালত' গঠনের বিধান রাখা হয়েছে। এ আইন বলবৎ হলে প্রতিটি জেলা ও মহানগরে খাদ্য আদালত গঠনের বাধ্যবাধকতা না থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

২.৪.৬ ভোক্তা বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি কর্তৃক নমুনা পরীক্ষার ব্যয়ভার বহনের বাধ্যবাধকতা

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে বিদ্যমান আইনসমূহে ভোক্তা বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি কর্তৃক ক্রুটিপূর্ণ নমুনা পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার বিধান রাখা হয়েছে। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৬২(৩) ধারায় বলা হয়েছে ম্যাজিস্ট্রেট কোনো পণ্যের নমুনা কোনো পরীক্ষাগারে প্রেরণের পূর্বে উক্ত পণ্যের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ যাচাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষার ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত ফি জমাদানের জন্য অভিযোগকারীকে নির্দেশ প্রদান করবেন। অপরদিকে নিরাপদ খাদ্য আইন,২০১৩ এর ৭৩(৩) ধারায় বলা হয়েছে খাদ্য আদালত কোন খাদ্যদ্রব্যের নমুনায় উত্থাপিত অভিযোগ যাচাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষার ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত অর্থ বা ফি জমাদানের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করবে। আইনের এ বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেকসময় দেখা যায় ভোক্তার আর্থিক সক্ষমতা না থাকার কারণে ভোক্তা ব্যয় নির্বাহ করতে চায় না। সুতারাং সার্বিক দিক বিবেচনায় দেখা যায় নমুনা পরীক্ষা ব্যয়সাপেক্ষ ও প্রক্রিয়াগত জটিল হওয়ার কারণে আইনের এ বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেকসময় ভোক্তা তার অভিযোগ দায়েরে আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে পারে।

২.৪.৭ ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সহায়তা গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা না থাকা

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে র্কাযক্রম সম্পাদনের ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী ও অন্যান্য সংস্থার সহায়তা গ্রহণের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায়। আইনে বলা হয়েছে মহাপরিচালক বা তার নিকট হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা বা অন্যকোনো সরকারি বা সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষকে এ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সহযোগিতার জন্য অনুরোধ করতে পারবেন। কিন্তু এই অনুরোধ রক্ষার্থে বা পালনে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের বাধ্যবাধকতার বিষয়ে উল্লেখ করা হয় নি। এর ফলে অনেকসময় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সহায়তা প্রদানে শিথিলতা প্রদর্শন করে এবং অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা কার্যসম্পাদনে বাধার সম্মুখীন হয়।

২.৪.৮ খাদ্যপণ্য পরিদর্শনে পরিদর্শকদের আইনি সীমাবদ্ধতা

মাঠপর্যায়ে খাদ্য পরিদর্শনে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের কাজের আওতা আইন দ্বারা নির্ধারণ করা হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকারের স্যানিটারি ইন্সপেক্টররা শুধুমাত্র বাংলাদেশ পিওর ফুড রুলস ১৯৬৭ তে উল্লেখিত ১০৭ ধরনের খাদ্যপণ্যের নমুনা

---

২০ বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ এর ৪১(১) ধারায় বলা হয়েছে, The Government may, by notification in the official gazette, establish one or more pure food court, as it considers necessary, in each district and metropolitan area for the purpose of this ordinance.

২১ নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর ৬৪(১) ধারায় বলা হয়েছে, এই আইনের অধীন অপরাধ বিচারের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক আদালত থাকিবে যাহা বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত নামে অভিহিত হইবে

সংগ্রহ করতে পারে। অপরদিকে বিএসটিআই অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী ফিল্ড অফিসারদের কার্যক্রম ৫৮টি শিল্পজাত খাদ্য আইটেমের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এর ফলে অনেক খাদ্যপণ্য পরিদর্শনের বাইরে থেকে যায়।

২.৪.৯ আইনে কঠোর শাস্তিদণ্ডের অভাব

বাংলাদেশে খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট আইনগুলোর শাস্তি ও জরিমানার ধরণ বিশ্লেষণে দেখা যায় বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি, খাদ্যে ভেজালের ভয়াবহতা, অপরাধ সংগঠনকারীদের আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনায় জরিমানা ও শাস্তির পরিমান কম। উদাহরণস্বরূপ- বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ (সংশোধিত ২০০৫) এ সর্বোচ্চ ১ বছর সশ্রম কারাদণ্ড বা ৫০ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডের বিধান রয়েছে, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এ সর্বোচ্চ ৩ বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ২ লক্ষ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডের বিধান রয়েছে। নতুন প্রণীত নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ তে জরিমানা ও শাস্তির পরিমান বৃদ্ধি করে অনুর্ধ্ব ৫ বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ লক্ষ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডের বিধান করা হয়েছে। অপরদিকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কঠোর আইন প্রয়োগের মাধ্যমে খাদ্যে ভেজাল মেশানোর অপরাধে যথোপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হয়। খাদ্যে ভেজাল মেশানোর অপরাধে ভারতে যাবজ্জীবন,পাকিস্তানে ২৫ বছর কারাদণ্ড, যুক্তরাষ্ট্রে সশ্রম কারাদণ্ড এবং চীনে মৃত্যুদণ্ডের (২০০৯ সালে দুধে ভেজাল মিশ্রণের কারণে দুই ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়[২২]) বিধান রয়েছে। উপরোল্লিখিত দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশে শাস্তি ও জরিমানার পরিমান কম পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ তে জরিমানা ও শাস্তির পরিমান বৃদ্ধি করা হলেও এখানে সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয় নি।

সারণি ২.২ : বাংলাদেশে খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে বিভিন্ন আইনে শাস্তির ধরন

আইন/ অধ্যাদেশ	সর্বোচ্চ শাস্তি ও জরিমানার পরিমান
নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩	অনুর্ধ্ব ৫ বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ লক্ষ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড
ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯	সর্বোচ্চ ৩ বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ২ লক্ষ টাকা জরিমানা, বা উভয় দণ্ড
বিএসটিআই অধ্যাদেশ, ১৯৮৫	সর্বোচ্চ ৪ বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ১ লক্ষ টাকা জরিমানা, বা উভয় দণ্ড
বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ (সংশোধিত.২০০৫)	সর্বোচ্চ ১ বছর সশ্রম কারাদণ্ড বা ৫০ হাজার টাকা জরিমানা, বা উভয় দণ্ড
দণ্ডবিধি, ১৮৬০	৬ মাস কারাদণ্ড অথবা ১ লক্ষ টাকা জরিমানা

২.৪.১০ আদালতে মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রতা ও অভিযুক্ত কোম্পানি কর্তৃক নিম্নমানের খাদ্যপণ্য উৎপাদন অব্যহত থাকা

নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত মামলা নিস্পত্তির ক্ষেত্রে খাদ্য আদালত বা নিম্ন আদালতে দীর্ঘসূত্রতা লক্ষ্যণীয়। সাধারণত স্যানিটারি ইন্সপেক্টররা নিম্ন আদালতে মামলা করার পর সংশ্লিষ্ট কোর্ট- বিবাদি পক্ষ বা আসামিকে হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করে। এক্ষেত্রে আসামি সশরীরে কোর্টে হাজির হয়ে অথবা তার পক্ষে নিযুক্ত আইনজীবি নির্দিষ্ট সময় চেয়ে আবেদন করে। নিম্ন আদালত হতে প্রাপ্ত এ সুযোগ বা প্রদত্ত সময়ের তোয়াক্কা না করে প্রায়শ বিবাদি বড় কোম্পানিগুলো উচ্চ আদালতে সংবিধানের ৪০ নং অনুচ্ছেদে[২৩] বর্ণিত পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হয়েছে দাবি করে বাদি পক্ষের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। এক্ষেত্রে উচ্চ আদালত বিষয়টিকে আমলে নিয়ে নিম্ন আদালতকে কারণদর্শাও নোটিশ প্রদান করে এবং উচ্চ আদালতের শুনানি না হওয়া পর্যন্ত নিম্ন আদালতের সকল কার্যক্রম স্থগিত রাখে। বিবাদি পক্ষের এ মামলার প্রেক্ষিতে নিম্ন আদালতের কার্যক্রম অনেকসময়ই ৬ মাস থেকে ২ বছর অথবা আরো দীর্ঘসময় ধরে স্থগিত থাকে। অপরদিকে অনেকসময় উচ্চ আদালত রুলের নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বাদিপক্ষ কর্তৃক অভিযুক্ত কোম্পানি পরিদর্শণসহ নমুনা সংগ্রহের সকল কার্যক্রম স্থগিত রাখে। এর ফলে দেখা যায় অভিযুক্ত কোম্পানি বা ব্যক্তি আদালতে মামলা অনিষ্পন্ন থাকা অবস্থায়ও নিম্নমানের খাদ্য উৎপাদন অব্যহত রাখে। উদাহরণস্বরূপঃ ২০১১-১২ সালে প্রাণ অ্যাগ্রো কোম্পানির বিরুদ্ধে দুটি মামলা বিচারাধীন (বিশুদ্ধ খাদ্য আদালতের মামলা নম্বর ৫০/২০১২ ও ১৯৩/২০১১) থাকা অবস্থায় তাদের পণ্যের মান উন্নয়ন না করা[২৪]।

[২২] http://news.bbc.co.uk/2/hi/asiapacific/7843972.stm (accessed on 11 January 2014)

[২৩] সংবিধানের ৪০ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে কোন পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের কিংবা কারবার বা ব্যবসায় পরিচালনার জন্য আইনের দ্বারা যোগ্যতা নির্ধারিত হইয়া থাকিলে অনুরূপ যোগ্যতা সম্পন্ন প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন আইনসঙ্গত পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের এবং যে কোন আইরসঙ্গত কারবার বা ব্যবসায় পরিচালনার অধিকার থাকিবে

[২৪] প্রাণের টমেটো সসে ভেজাল ২ মামলা, দৈনিক সংগ্রাম, ৫ জুলাই, ২০১২

২.৪.১১ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মধ্যে আইন সম্পর্কে অস্পষ্টতা

'নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩' তে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত বিভিন্ন সংস্থা ও কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সমন্বয় সাধনের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আইনটি চূড়ান্তকরণে তৃণমূল পর্যায়ে যেসকল অংশীজন বর্তমানে দায়িত্ব পালন করছে তাদের মতামত ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয় নি। এরফলে আইনটির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় জটিলতার ঝুঁকি রয়েছে।

আবার নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে বিদ্যমান আইন যেমন- বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ, ১৯৫৯, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯, বিএসটিআই অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ বিভিন্ন বিধি-বিধান সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট তদারকি কর্তৃপক্ষের মধ্যে পর্যাপ্ত জ্ঞানের ঘাটতি রয়েছে। অপরদিকে এসকল আইনের বিভিন্ন বিধি বিধান সম্পর্কে খাদ্য প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতাদের মধ্যেও সচেতনতার অভাব রয়েছে।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ তথা খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে উল্লিখিত আইন তিনটির- বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ (সংশোধিত ২০০৫), নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য থাকলেও এগুলোর কিছু সীমাবদ্ধতা ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ লক্ষণীয়। এগুলো হলো- বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ ও ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এ ভোক্তাদের সরাসরি মামলা দায়ের করার বিধান না থাকা, নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এ সরাসরি মামলা করার বিধান থাকলেও এক্ষেত্রে ৩০ দিনের বাধ্যবাধকতা থাকা, ভোক্তা বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি কর্তৃক ত্রুটিপূর্ণ নমুনা পরীক্ষার ফি জমাদানের বাধ্যবাধকতা, ভোক্তার অভিযোগ নিরসনে প্রক্রিয়াগত জটিলতা, জেলা ও মহানগর পর্যায়ে খাদ্য আদালত গঠিত না হওয়া, বিদ্যমান আইনে কঠোর দণ্ডের অভাব এবং আদালতে মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রতা ও অভিযুক্ত কোম্পানি কর্তৃক নিম্নমানের খাদ্যপণ্য উৎপাদন অব্যহত থাকা উল্লেখযোগ্য। অপরদিকে বিশুদ্ধ খাদ্য বিধি, ১৯৬৭'তে স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের খাদ্যপণ্যের নমুনা সংগ্রহ কার্যক্রম ১০৭টি খাদ্য আইটেমের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। এর ফলে অনেক খাদ্যপণ্য পরিদর্শনের বাইরে থেকে যায়। আইনের এ সকল সীমাবদ্ধতা ও বাস্তবায়ন পর্যায়ে চ্যালেঞ্জের কারণে আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এসব আইনের সুফল পায় না এবং সার্বিকভাবে নিরাপদ খাদ্যের আইনি প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হয়। উপরন্তু আইনি এ সকল সীমাবদ্ধতার কারণে মাঠ পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও খাদ্যে ভেজালকারীরা নানাবিধ অনিয়ম ও দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণের সুযোগ পায়।

প্রশাসন ও তদারকি ব্যবস্থা

নিরাপদ ও মানসম্মত খাদ্য নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের একটি অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে বিবেচিত। এ লক্ষ্যে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশেই খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, তদারকি এবং এ সংক্রান্ত আইন ও বিধিসমূহ প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের জন্য একটি বিশেষায়িত সংস্থা কাজ করে থাকে (যেমন: ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের ফুড এন্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন)। আমাদের দেশে খাদ্য তদারকির ক্ষেত্রে এ ধরনের বিশেষায়িত সংস্থা না থাকলেও সরকারের ১০টি মন্ত্রণালয়ের প্রায় ১২টি সংস্থা/বিভাগ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিরাপদ খাদ্যের প্রশাসনিক ও তদারকি সংশ্লিষ্ট কাজের সাথে যুক্ত রয়েছে। সম্প্রতি প্রণীত নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩'তে 'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ' গঠনের বিধান করা হয়েছে।

বক্স- ২

"আমাদের দেশে খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ বা খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধের জন্য বিশেষায়িত কোনো সংস্থা নেই, যদিও খাদ্যে ভেজাল নিয়ন্ত্রণ ও ভেজাল সনাক্ত করার জন্য জনস্বাস্থ্য বিষয়ক প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়গুলোকে কিছু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আসলে এগুলো নামেমাত্র দায়িত্ব দেওয়া। কার্যকরভাবে তারা সুনির্দিষ্টভাবে কোনো দায়িত্ব পালন করছে না।"

- মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার

এ গবেষণায় নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ তথা খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে বর্তমানে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মধ্যে মাঠ পর্যায়ের কর্মপরিধি ও দায়িত্বপালনের গুরুত্ব বিবেচনায় ছয়টি প্রতিষ্ঠান যথা- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনে পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তর, শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই), অর্থ মন্ত্রণালায়ের অধীনে কাস্টমস বিভাগ (বন্দর) এবং মোবাইল কোর্টের কার্যক্রম আলোচনা করা হয়েছে।

চিত্র:৩.১ নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে প্রশাসন, তদারকি ও পরিবীক্ষণ সংশ্লিষ্ট অংশীজন

এছাড়া উল্লেখিত সরকারি অংশীজন ছাড়াও বেসরকারি পর্যায়ে গণমাধ্যম (ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া) ও সুশীল সমাজের বিভিন্ন সংগঠন নিরাপদ খাদ্যের পরিবীক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ অধ্যায়ে মাঠ পর্যায়ে এ প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা, সীমাবদ্ধতা এবং সুশাসনের চ্যালেঞ্জ আলোচনা করা হয়েছে।

৩.১ নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে প্রশাসন ও তদারকি সংশ্লিষ্ট অংশীজনের ভূমিকা

৩.১.১ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত এলাকার বাইরে নিরাপদ খাদ্যের তদারকি করে থাকে। এ অধিদপ্তর নিরাপদ খাদ্যের তদারকি কার্যক্রম স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের মাধ্যমে করে থাকে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীনে প্রতিটি জেলায় একজন করে 'জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর' ও প্রতিটি উপজেলায় একজন করে 'স্যানিটারি ইন্সপেক্টর' রয়েছে। জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টররা সিভিল সার্জনের কার্যালয়ে ও উপজেলা পর্যায়ের স্যানিটারি ইন্সপেক্টররা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার (ইউএইচএফপিও) কার্যালয়ে বসে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে। জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর তার আওতাধীন উপজেলাসমূহের স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের কার্যাদি তদারক করেন। স্যানিটারি ইন্সপেক্টররা বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ (সংশোধিত) ২০০৫ এবং পিওর ফুড রুলস ১৯৬৭ অনুসারে নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করে থাকে:

- খাদ্য প্রস্তুতকারক ও প্রক্রিয়াকরণ প্রতিষ্ঠান এবং বিক্রয়স্থল পরিদর্শন ও তদারকি
- মাঠ পর্যায়ে খাদ্যের নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষাগারে প্রেরণ
- মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় এজেন্সি হিসেবে কাজ করা
- নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত কেস ফাইল করা ও আদালতে সাক্ষ্য দেওয়া

৩.১.২ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন)

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনে দেশের ৩১৯টি পৌরসভা ও ১১টি সিটি কর্পোরেশনের নিযুক্ত স্যানিটারি ইন্সপেক্টররা নিরাপদ খাদ্য তদারকির দায়িত্বে নিয়োজিত। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকল্পে তারা পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত এলাকাসমূহে কাজ করে থাকে। প্রতিটি পৌরসভাতে স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের একটি করে অনুমোদিত পদ রয়েছে। অপরদিকে সিটি কর্পোরেশনগুলোর আয়তন ও জনসংখ্যা অনুযায়ী স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়। বর্তমানে সারা দেশে পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনগুলোতে প্রায় ৭৮ জন[২৫] স্যানিটারি ইন্সপেক্টর কর্মরত রয়েছে। পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনগুলোর খাদ্য পরিদর্শন ও তদারকিমূলক কার্যক্রমের আইনি ভিত্তি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাথে সাদৃশপূর্ণ। স্যানিটারি ইন্সপেক্টররা মূলত বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ (সংশোধিত) ২০০৫ ও পিওর ফুড রুলস, ১৯৬৭ এর আওতায় কাজ করে থাকে। এছাড়া তারা স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) অধ্যাদেশ, ২০০৮ ও স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) অধ্যাদেশ, ২০০৮ এর আওতায় কিছু অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করে থাকে।

৩.১.৩ বিএসটিআই

বিএসটিআই শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। বিএসটিআই দেশীয় বিভিন্ন ধরনের শিল্পপণ্য ও খাদ্যপণ্যের গুণগত মান নিশ্চিত করতে কাজ করে থাকে এবং মান নিয়ন্ত্রণপূর্বক সার্টিফিকেট প্রদান করে। বিএসটিআই সব ধরনের খাদ্যসামগ্রীর মান যাচাই করে না, তাদের কার্যক্রম শুধুমাত্র ৫৮টি[২৬] খাদ্যপণ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বিএসটিআই এর খাদ্য পরিদর্শন ও তদারকি কার্যক্রম ঢাকাসহ পাঁচটি আঞ্চলিক অফিস (চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট) এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। বর্তমানে সারা দেশে ৩৮জন ফিল্ড অফিসার কর্মরত আছে[২৭]। খাদ্যপণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির কাজে মাঠ পর্যায়ে এ সকল ফিল্ড অফিসাররা কাজ করে থাকে। ফিল্ড অফিসাররা বাংলাদেশ স্টান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৫(সংশোধনী), স্টান্ডার্ডস অব ওয়েটস অ্যান্ড মেজারস (সংশোধনী) আইন, ২০০১, দি বাংলাদেশ স্টান্ডার্ডস অব ওয়েটস অ্যান্ড মেজারস (প্যাকেজড কমোডিটিস) রুলস, ২০০৭ এবং দি প্রডাক্ট লেবেলিং পলিসি, ২০০৬ অনুযায়ী তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে।

[২৫] Food Inspection and enforcement in Bangladesh: Current arrangement and Challenges, Food and Agricultural Organization, October, 2010, http:www.bdfoodsafety.org

[২৬] ৫৮টি খাদ্যপণ্যের বিস্তারিত পরিশিষ্টে দেখুন

[২৭] বিএসটিআই, ২০১৪, ঢাকা

নিম্নে শুধুমাত্র নিরাপদ খাদ্য তদারকি ও পরীবিক্ষণে ফিল্ড অফিসারদের দায়িত্ব দেওয়া হল:

- সিএম লাইসেন্সের আওতাভুক্ত খাদ্যপণ্যের গুনগত মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিএসটিআই কর্তৃক আরোপিত শর্তাবলী অনুযায়ী মান চিহ্ন ব্যাবহার হচ্ছে কিনা এবং নির্দেশিত টেস্টিং কর্মসূচী যথাযথভাবে সম্পাদিত হচ্ছে কি না তা যাচাই করা
- যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান সিএম লাইসেন্স গ্রহন/নবায়নের জন্য আবেদন করেছে যে সকল প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনপূর্বক নমুনা সংগ্রহ করে পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রস্তুত করা
- বন্দরগুলোতে আমদানিকৃত খাদ্যপণ্যের তদারকি ও পরিদর্শনে কাস্টমস হাউজের সাথে কাজ করা
- নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষাগারে প্রেরণ করা
- মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় প্রসিকিউটিং এজেন্সি হিসেবে কাজ করা

৩.১.৪ জাতীয় ভোক্তা–অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২০১০ সালে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর বাজার মনিটরিং কার্যক্রমের মাধ্যমে ভূমিকা পালন করে থাকে। এ অধিদপ্তরের আওতায় প্রত্যেক জেলায় জেলা প্রশাসককে সভাপতি এবং জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত তাঁর কার্যালয়ে কর্মরত অন্যূন সহকারী কমিশনার পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তাকে সচিব করে ১১ সদস্যবিশিষ্ট ‘জেলা ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ কমিটি’ নামে একটি জেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ কমিটি জেলা পর্যায়ে ভোক্তা অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের জন্য কাজ করছে। নিরাপদ খাদ্যের তদারকি ও ভেজালরোধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর বিভিন্ন অংশীজনের সমন্বয়ে বাজার তদারকি ও পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনার করে।

৩.১.৫ জনপ্রশাসন –মোবাইল কোর্ট

খাদ্যে ভেজাল নিয়ন্ত্রণে জরুরি ও তাৎক্ষণিক আইনি ব্যবস্থা হিসেবে মোবাইল কোর্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এর মাধ্যমে মূলত সংগঠিত অপরাধ তাৎক্ষণিকভাবে আমলে এনে দণ্ড ও জরিমানা আরোপ করা হয়। খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার তৈরী, খাদ্যে ভেজাল মেশানো এবং খাবার বিক্রয়ে প্রতারণার ঘটনাগুলোকে বিবেচনায় আনা হয়। মোবাইল কোর্ট মূলত জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের প্রশাসন অথবা সিটি কর্পোরেশনের মাধ্যমে একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে বিভিন্ন সংস্থা ও বিভাগের প্রসিকিউশন অফিসারদের সমন্বয়ে পরিচালিত হয়ে থাকে। এছাড়া আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় সহায়তা প্রদান করেন। মোবাইল কোর্টের যাবতীয় কার্যক্রম মোবাইল কোর্ট অধ্যাদেশ, ২০০৯ অনুযায়ী পরিচালিত হয়। মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটরা উপজেলা/জেলা প্রশাসনের পক্ষে কাজ করেন। প্রাথমিকভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা মূলত ভোক্তা কর্তৃক গৃহীত অভিযোগ, ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। স্থানীয়ভাবে সকল ধরনের খাদ্যপণ্যকে মোবাইল কোর্টের আওতায় আনা হলেও নমুনা গ্রহণ করা হয় শুধুমাত্র বাংলাদেশ বিশুদ্ধ খাদ্য বিধি, ১৯৬৭ এ উল্লেখিত ১০৭টি খাদ্যপণ্যের। নিম্নে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ তথা খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মুখ্য দায়িত্ব দেওয়া হল:

- মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় নিরাপদ খাদ্য তদারকি সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং বাজার তদারকি ও পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা
- খাদ্যপণ্য প্রস্তুত, উৎপাদন ও বিক্রয়স্থল তদারিক ও পরিদর্শন করা
- সংগঠিত অপরাধ তাৎক্ষণিকভাবে আমলে এনে দন্ড ও জরিমানা আরোপ করা

৩.১.৬ কাস্টমস হাউজ

বিদেশ হতে আমদানিকৃত খাদ্যপণ্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণে কাস্টমস হাউস অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে দেশের বিভিন্ন বন্দরে দায়িত্ব পালন করে থাকে। আমাদের দেশে আমদানিকৃত খাদ্যপণ্য তিনটি বিমানবন্দর, দুইটি সমুদ্রবন্দর ও ১৪টি স্থল বন্দরের মাধ্যমে প্রবেশ করে। আমদানিকৃত খাদ্যদ্রব্যের ৮০ শতাংশই চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর ও বেনাপোল স্থল বন্দরের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। বিদেশ হতে আমদানিকৃত খাদ্যপণ্যগুলো মূলত মোড়কজাত, প্রক্রিয়াজাত ও কাঁচামালের হয়ে থাকে। আমদানিকৃত খাদ্যদ্রব্য পরিদর্শনে কাস্টমস সুপারিনটেন্ডেন্ট বন্দরগুলোতে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করে থাকে। তিনি একজন সহকারি কমিশনারের অধীনে দায়িত্ব পালন করেন। বন্দরগুলোতে সাধারণত সহকারি কমিশনার, সুপারিনটেন্ডেন্ট, বন্দর প্রতিনিধির তত্ত্বাবধানে এবং সিএন্ডএফ এজেন্টের সম্মুখে আমদানিকৃত পণ্যের নমুনা সংগ্রহ করা হয় এবং পরবর্তীতে সংগৃহীত নমুনার একটি অংশ বিভিন্ন পরীক্ষাগারে পাঠানো হয়। কাস্টমস হাউজগুলো আমদানিকৃত খাদ্যপণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও

তদারকির ক্ষেত্রে আমদানি নীতি আদেশ, ২০১২-১৫ অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করে। নিম্নে শুধুমাত্র আমদানিকৃত খাদ্যপণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও পরিবীক্ষণে কাস্টমস হাউজের দায়িত্ব দেওয়া হল:

- আমদানিকৃত খাদ্যপণ্যের স্পেশ্যাল এপ্রেইজমেন্ট করা
- সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষার জন্য পরীক্ষাগারে পাঠানো
- খাদ্যপণ্য খালাসের অনুমোদন দেওয়া

৩.২ খাদ্য তদারকি ও পরিবীক্ষণে অংশীজনের সীমাবদ্ধতা ও সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

৩.২.১ নিরাপদ খাদ্যের তদারকিতে সুনির্দিষ্ট বা পৃথকভাবে পদ না থাকা

নিরাপদ খাদ্যের নজরদারিতে সরকারের ১০টি মন্ত্রণালয়ের প্রায় ১২টি বিভাগ/সংস্থা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিয়োজিত রয়েছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দৈনন্দিন কাজের তালিকার একটি অংশ হিসেবে এ কাজটিকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে কিন্তু শুধুমাত্র নিরাপদ খাদ্যের তদারকিতে এ সকল প্রতিষ্ঠানে সুনির্দিষ্ট বা পৃথকভাবে কোনো পদ নেই। উদাহরণস্বরুপ- নিরাপদ খাদ্যের তদারকিতে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মধ্যে মাঠ পর্যায়ে প্রত্যক্ষভাবে দায়িতপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হচ্ছে যথাক্রমে- স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনসমূহ। এ দায়িত্ব পালনের জন্য এ প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্যানিটারি ইন্সপেক্টররা কাজ করে থাকেন। কিন্তু স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের দায়-দায়িত্ব[২৮] বিশ্লেষণে দেখা যায় নিরাপদ খাদ্যের তদারকিমূলক কাজ ছাড়াও তাদেরকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, স্বাস্থ্য শিক্ষা, ইপিআই, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনসহ ও বিভিন্ন জনস্বাস্থ্য বিষয়ক কাজ করতে হয়। এসকল কাজে তারা প্রায় ৭০ শতাংশের বেশি সময় ব্যয় করে থাকে। এর ফলে তাদের কাছে নিরাপদ খাদ্যের তদারকির কাজটি গৌণ দায়িত্ব হিসেবে পরিগণিত হয়।

৩.২.২ মাঠ পর্যায়ে তদারকি কার্যক্রমে জনবলের স্বল্পতা

নিরাপদ খাদ্যের তদারকি কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও বিএসটিআই) কাজের পরিধি ও ভৌগোলিক আওতা বিবেচনায় মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবলের অভাব রয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের কর্ম এলাকা দেশের ৬৪টি জেলা ও ৪৮৭টি উপজেলায় বিস্তৃত। নিরাপদ খাদ্যের তদারকি কার্যক্রমে বর্তমানে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী সারা দেশে ৫৬৬ জন স্যানিটারি ইন্সপেক্টর কর্মরত। অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী সবগুলো পদ পূরণ থাকলেও তাদের কাজের ক্ষেত্র ও পরিধি বিবেচনায় এই জনবল যথেষ্ঠ নয়।

প্রতিষ্ঠান	কাজের আওতা	অনুমোদিত পদ	কর্মরত
স্যানিটারি ইন্সপেক্টর-(স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান)	৩১০টি পৌরসভা ও ৮টি সিটি কর্পোরেশন	৩৭০	৭৮ জন
স্যানিটারি ইন্সপেক্টর-স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	৬৪টি জেলা ও ৪৮২টি উপজেলা	৫৬৬	৫৬৬ জন
ফিল্ড অফিসার-বিএসটিআই	সকল জেলা ও বিভাগীয় শহর	৬৮	৩৮জন

তথ্য সূত্র: স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ২০১৪ ঢাকা; বিএসটিআই, ২০১৪ ঢাকা; এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট- www.paurainfo.gov.bd ও www.bdfoodsafety.org হতে সংগৃহীত।

অপরদিকে নিরাপদ খাদ্যের তদারকি কার্যক্রমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও বিএসটিআই এর অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী জনবলের ঘাটতি রয়েছে। বর্তমানে দেশের ৩১৯টি পৌরসভা ও ১১টি সিটি কর্পোরেশনে অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী ৩৭০টি স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের পদ রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে মাত্র ৭৮ জন কর্মরত আছে। অর্থাৎ বেশিরভাগ পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনে স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের পদ ফাঁকা রয়েছে। আবার সিটি কর্পোরেশনগুলোতে প্রয়োজনের তুলনায় স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের স্বল্পতা লক্ষণীয়। উদাহরণস্বরূপ- জনসংখ্যার ভিত্তিতে দেশের বৃহৎ ৩টি সিটি কর্পোরেশনের (ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিন সিটি কর্পোরেশন ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন) স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের সংখ্যা খুবই অপ্রতুল।

[২৮] বিস্তারিত পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য

ঢাকা সিটি কর্পোরেশন বিভক্তির পর এখনো পর্যন্ত অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী স্যানিটারি ইন্সপেক্টর নিয়োগ দেওয়া হয় নি। বর্তমানে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মোট ১০টি জোনে দুই জন করে মোট ২০ জন স্যানিটারি ইন্সপেক্টর কাজ করছে। অপরদিকে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতায় স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের মোট অনুমোদিত পদ ১৪টি থাকলেও বর্তমানে মাত্র চার জন কর্মরত রয়েছে।

বিএসটিআই এর মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম ঢাকাসহ ৫টি বিভাগীয় শহরের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এক্ষেত্রে বর্তমানে সারাদেশে ৩৮ জন ফিল্ড অফিসার রয়েছে (অনুমোদিত পদ ৬৮টি)। মাঠ পর্যায়ে ফিল্ড অফিসারদের কাজের আওতা ও পরিধি অনুযায়ী এই জনবল যথেষ্ঠ নয়। মাঠ পর্যায়ে এ সকল পদসমূহে প্রয়োজন অনুযায়ী জনবল স্বল্পতার কারনে নিরাপদ খাদ্যের নজরদারি কার্যক্রম চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। এর ফলে বিভিন্ন খাদ্যস্থাপনা (প্রস্তুতকারক, বিক্রেতা, খাদ্যের বাজার) অপরিদর্শিত থেকে যায়।

৩.২.৩ স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের পদমর্যাদায় ঘাটতি ও পদোন্নতিতে সমস্যা

স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের পদটি তৃতীয় শ্রেণীর। এ পদে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে কর্মরত স্বাস্থ্যসহকারীদের মধ্য হতে অভ্যন্তরীণভাবে নিয়োগ দেওয়া হয়। নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সহকারীদের মধ্যে যাদের কমপক্ষে তিন বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। পরবর্তীতে তাদেরকে ইন্সটিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি হতে তিন বছর মেয়াদি আন্ডার গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা (বর্তমানে ৪ বছর মেয়াদি) সম্পন্ন করতে হয়। স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের বিভাগীয়ভাবে পদোন্নতির কোনো সুযোগ নেই। উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টররা পদোন্নতির মাধ্যমে জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টরে উন্নীত হলে তাদের শুধুমাত্র বেতন স্কেলে পরিবর্তন হয় কিন্তু পদমর্যাদা তৃতীয় শ্রেণীতেই থেকে যায়।

বক্স- ৩

স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের পদমর্যাদায় ঘাটতি

একজন জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ভেজাল বিরোধী অভিযানে অংশগ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসন অফিসের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয়ে যান। সেখানে ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে অন্যান্য প্রসিকিউশন অফিসারদের সাথে তিনিও ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়িতে করে অভিযানে বের হন। সেদিন ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের কর্মতৎপরতা ও বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশের আইনি বিজ্ঞতায় খুশী হয়ে প্রশংসা করেন। কিন্তু পরের দিন তিনি যখন পুনরায় অন্যান্য প্রসিকিউশন অফিসারদের সাথে ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়িতে উঠতে গেলেন তখন ম্যাজিস্ট্রেট তাকে তার গাড়িতে না উঠে পুলিশের ভ্যানে কনস্টেবেলদের সাথে উঠতে বলেন। এতে তিনি অপমানিতবোধ করেন। পরবর্তীতে তিনি জানতে পারেন ম্যাজিস্ট্রেট চাকরিতে নতুন যোগ দেওয়ায় স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের পদমর্যাদা জানতেন না, তাই তার গাড়িতে নিয়েছিলেন। যখন জানতে পারেন তিনি একজন তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী, তখন পুলিশ কনস্টেবেলদের সাথে পুলিশ ভ্যানে উঠতে বলেন

স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের পদমর্যাদায় ঘাটতি রয়েছে। এ পদটি জনগুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এখনো তৃতীয় শ্রেণীর পদমর্যাদায় রয়ে গেছে। অথচ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে একই যোগ্যতা সম্পন্ন পদটি দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে। স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের পদটি তৃতীয় শ্রেণীর হওয়ায় নিরাপদ খাদ্যের সুষ্ঠু তদারকি কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়- স্যানিটারি ইন্সপেক্টররা বাজার পরিদর্শনে গেলে অনেক সময়ই খাদ্য ব্যবসায়ী বা দোকানদার কর্তৃক অবমূল্যায়িত হয়ে থাকেন। আবার মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালীন টিমের অভ্যন্তরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটসহ অন্যান্য প্রসিকিউটিং এজেন্সির কর্মকর্তা কর্তৃক অবমূল্যায়িত হয়ে থাকে। এছাড়া নিজ দপ্তরেও পেশাগত সুযোগ-সুবিধা ও নিরাপদ খাদ্যের তদারকি কার্যক্রম সংক্রান্ত মতামত পেশ করার ক্ষেত্রে অবমূল্যায়িত হয়ে থাকেন। এরফলে তারা হীনমন্যতায় ভোগে এবং কাজের আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। এখানে উল্লেখ্য যে, একসময় জেলা প্রশাসন অফিসের মাসিক সমন্বয় সভায় স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের প্রতিনিধিত্ব ছিল কিন্তু পরবর্তীতে তাদেরকে উক্ত সভা হতে বাদ দেওয়া হয়েছে। এর পেছনে স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের অনেকেই পদমর্যাদার ঘাটতিকে দায়ি করেন।

৩.২.৪ স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের প্রশিক্ষণের ঘাটতি ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্তিতে অনিয়ম

নিরাপদ খাদ্য তদারকির বিভিন্ন সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ যেমন- ফুড হ্যান্ডলিং প্রাকটিস, ইন্ডাসট্রিয়াল হাইজিন, কমিউনিকেবল ডিজিজ ও খাদ্য ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন চেইনের সমসাময়িক তথ্যাদি যেমন- হ্যাজার্ড অ্যানালিসিস অন ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্ট সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানের প্রয়োজন। মাঠ পর্যায়ে এ সকল ক্ষেত্রে কর্মরত স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের প্রশিক্ষণ অপরিহার্য। কিন্তু এসকল বিষয়ে স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের চাকরিকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা সীমিত। এর ফলে তারা মাঠ তদারকি ও পরিদর্শন কার্যক্রমের সকল নিয়মাবলী সঠিকভাবে পালন করতে পারেন না। আবার স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের চাকরিকালীন প্রশিক্ষণ প্রাপ্তিতে অনিয়ম লক্ষ করা যায়। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের অনেকেই তার চাকরি জীবনে উপরোক্ত

বিষয়সমূহের ওপর একবারও প্রশিক্ষণ পায়নি আবার অনেকে এ সকল বিষয়ে একাধিকবার প্রশিক্ষণ পেয়েছে। স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের প্রশিক্ষণ পাওয়ার ক্ষেত্রে অনেক সময় পদসংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণের চাহিদা ও গুরুত্ব বিবেচনা করা হয় না। এক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সাথে সুসম্পর্ক, যোগাযোগ ও সুপারিশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উদাহরণস্বরুপ, ঢাকাস্থ একটি হাসপাতালে কর্মরত একজন স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের নিরাপদ খাদ্যের তদারকি সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অনুযায়ী প্রয়োজন না থাকলেও তিনি উর্ধ্বতন কর্মকর্তা পর্যায়ে সু-সম্পর্ক ও যোগাযোগের কারণে একধিকবার প্রশিক্ষণ পেয়েছেন অথচ উপজেলা পর্যায়ে একজন স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের প্রশিক্ষণের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ ও যোগসাজস না থাকার কারণে একবারও প্রশিক্ষণ পাননি।

৩.২.৫ খাদ্য তদারকি ও পরিদর্শনে প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস ও যানবাহনের অভাব

মাঠ পর্যায়ে খাদ্য তদারকি ও পরিদর্শন কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস ও যানবাহনের অভাব রয়েছে। স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ও বিএসটিআই এর ফিল্ড অফিসারদের বাজার মনিটরিং করার জন্য দাপ্তরিকভাবে কোন যানবাহনের ব্যবস্থা নেই। এরফলে বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা শহরের বাজার পরিদর্শনে তারা ভোগান্তিতে পড়ে। এছাড়া স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের তাৎক্ষণিকভাবে খাদ্যের প্রাথমিক মান পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় কিটস যেমন: স্যাম্পলিং স্পুন, সারফেস থার্মোমিটার, ইনসার্ট থার্মোমিটার, ল্যাকটোমিটার, ফরমালিন টেস্টিং কিট, ক্যালসিয়াম কার্বাইড টেস্টিং কিট, পিএইচ মিটার, ম্যাগনিফাইং গ্লাস, ছুরি, কাঁচি, সুতা, হ্যান্ডগ্লোভস ইত্যাদির অভাব রয়েছে। এ সকল উপাদানের মধ্যে বর্তমানে তাদের কাছে শুধুমাত্র বড় সাইজের একটি ল্যাকটোমিটার সরবরাহ আছে।

৩.২.৬ পরিদর্শন গাইডলাইন ও ম্যানুয়াল এর অভাব

বিএসটিআই এর ফিল্ড অফিসারদের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে পরিদর্শন গাইডলাইন থাকলেও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিরাপদ খাদ্য তদারকিতে কোনো সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন ও পরিদর্শন ম্যানুয়াল নেই। এর ফলে তারা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়। এছাড়া স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনায় প্রতিবেদন প্রণয়ন ও নথিব্যবস্থা দুর্বল এবং এক্ষেত্রে তারা কোনো একক পদ্ধতি অনুসরণ করে না। পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, রিপোর্টিং এর ক্ষেত্রে একটি জেলার উপজেলাসমূহের মধ্যে রিপোর্টিং ফরমেটে পার্থক্য রয়েছে। এরফলে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে প্রেরিত প্রতিবেদনের তথ্য ব্যবস্থাপনায় সমস্যা তৈরী হয়। অপরদিকে জেলা প্রশাসন হতে প্রতিমাসে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার একটি মাসিক পরিকল্পনা তৈরী করা হলেও শুধুমাত্র খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে প্রতি মাসে কতটি বাজার, দোকান বা খাদ্য ব্যবসা পরিদর্শন করতে হবে সে সম্পর্কে কোনো গাইড লাইন বা নির্দেশনা নেই। এর ফলে নিয়মিতভাবে জেলা পর্যায়ে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ভেজাল বিরোধী অভিযান পরিলক্ষিত হয় না। উল্লেখ্য, মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় সম্প্রতি নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের জন্য মোবাইল কোর্ট ম্যানুয়াল তৈরী করা হয়েছে এবং কিছু জায়গাতে প্রশাসনিকভাবে প্রতি সপ্তাহে অন্তত একটি খাদ্যে ভেজাল বিরোধী মোবাইল কোর্ট পরিচালনার নির্দেশনা আছে।

৩.২.৭ খাদ্যের নমুনা সংগ্রহ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবহনের সমস্যা

মাঠপর্যায়ে পরিদর্শকরা খাদ্যপণ্যের নমুনা সংগ্রহের ক্ষেত্রে কোনো আদর্শ বা কাঠামোবদ্ধ নমুনায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করে না। তারা খাদ্য প্রস্তুতকারক ও প্রক্রিয়াকরণ প্রতিষ্ঠান এবং বিক্রয়স্থল হতে খাদ্যের নমুনা সংগ্রহ সাধারণত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অনুমানের ভিত্তিতে করে থাকে। নমুনা সংগ্রহের পর তা রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট জায়গা ও ব্যবস্থাপনার অভাব রয়েছে। পরিদর্শকরা সাধারণত সংগৃহীত নমুনা ডাকযোগে অথবা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে ঢাকাস্থ জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, বিএসটিআই, পরমাণু শক্তি কমিশন এবং ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ল্যাবরেটরিতে প্রেরণ করে। জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের তথ্যমতে, মাঠ পর্যায় হতে শুধুমাত্র সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ, মোড়কজাতকরণ ও দুর্বল পরিবহণ ব্যবস্থার কারণে প্রেরিত নমুনার ১৫ থেকে ২০ শতাংশ বাতিল হয়[২৯]।

৩.২.৮ খাদ্য তদারকি কার্যক্রমে স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের ঘাটতি

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের শুধুমাত্র নিরাপদ খাদ্যের তদারকি কার্যক্রমে পৃথক কোন অর্থ বরাদ্দ নেই। তাদেরকে মাঝে মাঝে উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা বা জেলা সিভিল সার্জন অফিসের কন্টিনজেন্সি ফান্ড হতে খুবই স্বল্প পরিমাণে বরাদ্দ দেওয়া হয় এবং তা অনিয়মিতভাবে প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার অফিসের মোট কন্টিনজেন্সি বাবদ মাসিক বরাদ্দ ২০০০ টাকা।

[২৯] পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরি, জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, ঢাকা

৩.২.৯ মাঠ পর্যায়ে অংশীজনের নিজস্ব বা চুক্তিভিত্তিক আইনজীবী না থাকা ও আইনি ব্যবস্থা গ্রহণে প্রভাব বিস্তার

নিরাপদ খাদ্যের বিধান লঙ্ঘনজণিত মামলা পরিচালনার জন্য বিএসটিআই এবং কিছু পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব বা চুক্তিভিত্তিক আইনজীবী থাকলেও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিজস্ব বা চুক্তিভিত্তিক আইনজীবী নেই। এক্ষেত্রে স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের নিজেকেই কোর্টে মামলা উপস্থাপন করতে হয়। বিবাদি পক্ষের আইনজীবি পেশাদার হওয়ার কারণে স্যানিটারি ইন্সপেক্টররা অনেকসময় যুক্তিতর্ক উপস্থাপনে সফল হতে পারে না। আবার আাইনি ব্যবস্থা গ্রহণ ও মামলা পরিচালনা কার্যক্রমে স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের ওপর স্থানীয় পর্যায়ের রাজনীতিবিদ, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, প্রভাবশালী ব্যক্তি ও ব্যবসায়ীরা প্রভাব বিস্তার করে থাকে। তাদেরকে অনেকসময় খাদ্য স্থাপনা বা খাদ্যব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে গেলে শারীরিক ও মানসিকভাবে ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হয়। স্যানিটারি ইন্সপেক্টররা অনেকসময়ই এ সকল ব্যক্তিবর্গের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাদের সাথে যোগসাজস করে থাকে। এর ফলে অনেকসময় নিরাপদ খাদ্যের বিধান লঙ্ঘনকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয় না।

৩.২.১০ মাঠ পর্যায়ের স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের পরিবীক্ষণ ও জবাবদিহিতা কাঠামোয় দ্বৈততা ও ঘাটতি

নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে মাঠ পর্যায়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের পরিবীক্ষণ ও জবাবদিহিতা ব্যবস্থায় দ্বৈততা ও ঘাটতি লক্ষ করা যায়। জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের দায়-দায়িত্বে[৩০] বলা হয়েছে তিনি উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের কাজ তদারক করবে এবং তারা তাদের দায়িত্ব ঠিকমত পালন করছে কি না সেটা নিশ্চিত করবে। আবার উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের দায়-দায়িত্বে[৩১] বলা হয়েছে তিনি উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার সরাসরি তত্ত্বাবধানে কাজ করবেন এবং সকল কাজের জন্য উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কাছে দায়ী থাকবেন। এখানে লক্ষ্যনীয় যে, জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টরকে উপজেলা পর্যায়ের স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের দৈনন্দিন কাজ তদারকির দায়িত্ব দেওয়া হলেও তার কাছে জবাবদিহিতা ব্যবস্থা রাখা হয়নি। আবার জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ও উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর উভয় পদ তৃতীয় শ্রেণীর হওয়ার কারনেও তাদের মধ্যে কার্যকরভাবে জবাবদিহি ব্যবস্থা গড়ে ওঠে না। জবাবদিহিতা ব্যবস্থার উপরোক্ত দ্বৈততার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে দায়দায়িত্ব পালনে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত না করে পরিদর্শকদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে এবং ফলাফল স্বরুপ স্যানিটারি ইন্সপেক্টররা তাদের দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে। উদাহরনস্বরুপ- একজন উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টরকে প্রতিমাসে তার আওতাভুক্ত এলাকা হতে কমপক্ষে পাঁচটি করে খাদ্যের নমুনা সংগ্রহ করে গবেষণাগারে প্রেরণের বিধান রয়েছে। কিন্তু শুধুমাত্র কার্যকর জবাবদিহিতা ও মনিটরিং এর অভাবে বেশিরভাগক্ষেত্রেই তাদের খাদ্যের নমুনা সংগ্রহের কাজের মাসিক পরিকল্পনা শুধু কাগজে কলমে থেকে যায়।

৩.২.১১ মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুলিশী সহায়তার অভাব

মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুলিশী সহযোগীতার অভাব লক্ষ করা যায়। অনেক সময় জেলা প্রশাসন অফিসে মোবাইল কোর্ট টিম প্রস্তুত থাকলেও পুলিশী সহায়তা না পাওয়ার কারণে তারা মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় বের হতে পারে না। প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুলিশী সহায়তার অভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় নিরাপত্তার ঝুঁকি লক্ষণীয়। অনেকসময় মোবাইল কোর্ট টিমকে বাজারের দোকান মালিক ও ব্যবসায়ীরা ঘেরাও করে এবং তাদের কার্যক্রমে বাধার সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে টিমের সাথে পর্যাপ্ত সংখ্যক পুলিশ সদস্য না থাকলে তারা আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয় এবং সার্বিকভাবে মোবাইল কোর্টের কার্যক্রম ব্যহত হয়।

বক্স-৪

মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় নিরাপত্তার ঝুঁকি

খাদ্যে ভেজাল নিয়ন্ত্রণে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে মোবাইল কোর্ট টিম একটি জেলা শহরের বড় বাজারের খাদ্যস্থাপনা ও বিক্রয়কেন্দ্র পরিদর্শনে যান। পরিদর্শনকালীন উক্ত বাজারের দোকান মালিক ও ব্যবসায়ীরা মোবাইল কোর্ট টিমের সদস্যদেরকে ঘেরাও করে তাদের কার্যক্রমে বাধার সৃষ্টি করে। টিমের সাথে মাত্র দুই জন পুলিশ সদস্য থাকায় তারা আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়। পরবর্তীতে স্থানীয় সাংবাদিক ও জনগণের সহায়তায় তাদেরকে মুক্ত করা হয়।

-মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার

৩.২.১২ পচনশীল খাদ্যপণ্যের বিতরণ প্রক্রিয়ায় ভেজাল মিশ্রণ ও তদারকির ঘাটতি

খাদ্যপণ্য পরিবহণ ও সংরক্ষণ পর্যায়ে বিশেষ করে পচনশীল খাদ্যের বিতরণ প্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রতার বিভিন্ন পর্যায়ে ফরমালিনসহ বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়। এ গবেষণায় পর্যবেক্ষণ

---

[৩০] জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের দায়-দায়িত্বের বিস্তারিত পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য

[৩১] উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের দায়-দায়িত্বের বিস্তারিত পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য

ও খাদ্য ব্যবসায়ীদের (বিশেষত পচনশীল খাদ্যদ্রব্য ব্যবসায়ী- মৎস্য ও ফলমূল) কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দেখা যায়, সংশ্লিষ্ট খাদ্যপণ্যের উৎপাদন বা উৎসস্থল হতে ভোক্তা পর্যায়ে পৌঁছাতে সাধারণত ৪/৫ টি ধাপ অতিক্রম করতে হয় এবং এ ধাপগুলোর বিতরণ প্রক্রিয়ায় যে ধাপে অবস্থানকাল (Length of Stay -LS) বেশি, সেসব ধাপে ক্ষতিকারক রাসায়নিক (ফরমালিন) ব্যবহারের ঝুঁকি লক্ষ্যণীয়। নিম্নে পচনশীল খাদ্যদ্রব্য হিসেবে মাছের বিতরণ ও সংরক্ষণ প্রক্রিয়ায় ক্ষতিকারক রাসায়নিকের (ফরমালিন) ব্যবহারের একটি চিত্র তুলে ধরা হলো-

চিত্র ৩.২: স্থানীয় উৎস হতে ঢাকা শহরের ভোক্তা পর্যায়ে মাছের বিতরণ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন পর্যায়ে গড় অবস্থানকাল

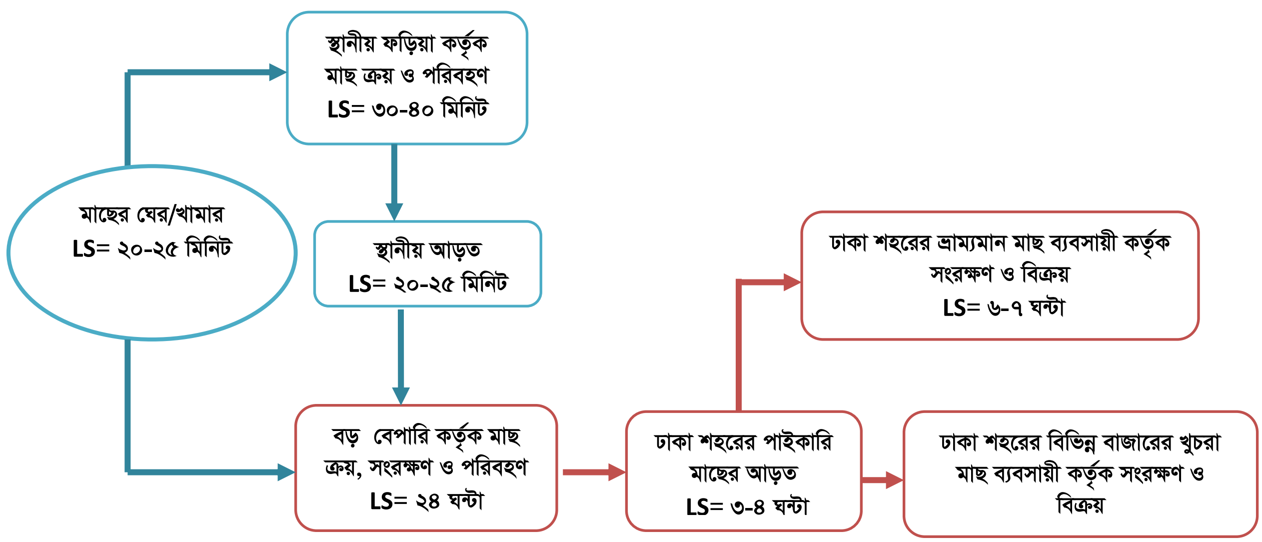

LS= Length of Stay

সূত্র: মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ এবং খুচরা ও পাইকারি মৎস ব্যবসায়ী, আড়তদার ও ঘের মালিকদের তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত।

মাছের ঘের বা খামার হতে স্থানীয় ফড়িয়া কর্তৃক মাছ ক্রয় করে প্রথমে স্থানীয় আড়তে আনা হয়। স্থানীয় মাছের আড়তগুলোতে জনসম্মুখে নিলামে মাছ সর্বোচ্চ ২০-২৫ মিনিট অবস্থান করে । এক্ষেত্রে দেখা যায় স্থানীয় ফড়িয়া ও স্থানীয় আড়তে LS হচ্ছে যথাক্রমে ৩০-৪০ মিনিট এবং ২০-২৫ মিনিট । স্থানীয় পর্যায়ের এ দু'ধাপে LS কম হওয়ায় মাছ পচনের ঝুঁকি থাকে না তাই এখানে মিশ্রণ করা হয় না। অপরদিকে বড় বেপারিরা সরাসরি মাছের ঘের অথবা স্থানীয় আড়ত হতে নিলামের মাধ্যমে মাছ ক্রয় ও সংরক্ষণ করে থাকে। বড় বেপারি কর্তৃক স্থানীয় পর্যায় হতে রাজধানীর বিভিন্ন আড়তে মাছ নিয়ে আসা ও সংরক্ষণের LS হচ্ছে প্রায় ২৪ ঘন্টা। এ পর্যায়ে রাস্তায় দীর্ঘ যানযট, ফেরিঘাটে ফেরি পেতে বিলম্ব হওয়া ও হিমায়িত পরিবহন ব্যবস্থার অভাবে গরমে মাছ পচে যাওয়ার আশঙ্কায় বড় বেপারিরা স্থানীয় পর্যায়ে মাছে ফরমালিন মিশিয়ে থাকে। আবার ঢাকা শহরের আড়তগুলোতে (কারওয়ান বাজার, যাত্রাবাড়ি আড়ত) মাছের LS হচ্ছে সর্বোচ্চ ৩-৪ ঘন্টা। এ পর্যায়ে LS তুলনামূলক কম হওয়া সত্ত্বেও মাছে ফরমালিন মেশানো হয়। উপরন্তু সরাসরি পর্যবেক্ষণে ঢাকা শহরের কারওয়ান বাজারের মাছের আড়তে ফরমালিন মেশানোর সরঞ্জাম লক্ষ্য করা যায়। এ বাজারের কয়েকটি আড়তের কর্মচারীদের ভাষানুযায়ী-

"আমরা সব এলাকার মাছে ওষুধ মেশাই না। ঢাকা শহরের আশেপাশের এলাকা হতে মাছ আসলে ওষুধ মেশাই না। আমরা বেশিরভাগ বাগেরহাট, খুলনা ও সাতক্ষীরা এলাকার মাছে ওষুধ মিশিয়ে থাকি। এসব এলাকার মাছ আসতে বেশি সময় লাগে, গরমে মাছ নরম হয়ে পচে যায়। তাই আমরা বড় ড্রামে পানির সাথে ওষুধ মিশিয়ে মাছ ডুবিয়ে রাখি। এছাড়া আমাদের সাথে বড় ইনজেকশন সিরিঞ্জও আছে, তা দিয়ে বড় মাছের পেটে ওষুধ পুশ করি"।

আবার ঢাকা শহরের বিভিন্ন মাছের আড়ত হতে বিভিন্ন খুচরা বাজারে মাছ সংরক্ষণ ও বিক্রয়ে LS হচ্ছে ১২-১৩ ঘণ্টা এবং ভ্রাম্যমান মৎস্য ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রে হচ্ছে ৬-৭ ঘন্টা। এ দু'টি ধাপে মাছ ব্যবসায়ীরা সাধারণত মাছ রক্ষণাবেক্ষণে বরফে ফরমালিন মিশিয়ে থাকে। সুতারাং দেখা যাচ্ছে স্থানীয় উৎস হতে মাছ যতই ঢাকামুখী হতে থাকে মাছে ফরমালিনের ব্যবহার ততই বাড়তে থাকে। উপরন্তু মৎস্য অধিদপ্তরের মৎস্য সংরক্ষণে ফরমালিনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণও গণসচেতনতা সৃষ্টি প্রকল্পের তথ্য অনুযায়ী ১৩ জুন-১১ আগস্ট ২০১২ সময়কালে ঢাকা শহরের ৩৬টি মাছের বাজার, আড়ত ও সুপার শপে ২৭টি ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করা হয়। এসব স্থানের ৫৪০টি মাছ পরীক্ষা করে ৮ শতাংশ মাছে ফরমালিন পাওয়া যায়। অপরদিকে জেলা পর্যায়ের ৬১৮টি নমুনায় ১ শতাংশ মাছে ফরমালিন পাওয়া যায়।[৩২]

পচনশীল খাদ্যের বিতরণ প্রক্রিয়ার এ সকল ধাপে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের কার্যকর তদারকির ঘাটতি রয়েছে। উদাহরণস্বরুপ- ২০১৩ সালে এফবিসিসিআই কয়েকটি বেসরকারি ব্যাংকের সহায়তায় ঢাকা মহানগরীসহ বিভিন্ন জেলার মোট ১৮টি[৩৩] কাঁচা বাজারকে ফরমালিনমুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। প্রাথমিকভাবে এ উদ্যোগে সরকারি অংশীজনসমূহের (বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ভোক্তা সংরক্ষণ অধিদপ্তর, সিটি কর্পোরেশন, স্বাস্থ্য ও মৎস্য অধিদপ্তর) সহযোগিতা অব্যাহত ছিল কিন্তু পাঁচ/ছয় মাস পরে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের পক্ষ হতে নিয়মিতভাবে পরিদর্শন ও মনিটরিং অব্যাহত না থাকায় অনেক বাজারেই ফরমালিনমুক্ত করার এ প্রয়াস স্থবির হয়ে পড়ে। উল্লেখ্য যে, ২০১০ সালেও কারওয়ান বাজারকে ফরমালিনমুক্ত ঘোষনা করা হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীতে মনিটরিং ও নিয়মিত তদারকির অভাবে তা সফল হয়নি। এছাড়া বাজার মনিটরিং ও তদারকির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মধ্যে একে অপরের ওপর দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়ার মানসিকতা বিদ্যমান। এ সকল কারণে বিভিন্ন সময়ে খাদ্যে ভেজালরোধে সরকারি বা বেসরকারিভাবে গৃহীত পদক্ষেপ টেকসই হয় না।

৩.২.১৩ নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয়, সহযোগিতা ও যোগাযোগের অভাব

নিরাপদ খাদ্য তদারকিতে মাঠ পর্যায়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শুধুমাত্র আইনিভাবে তাদের কর্ম এলাকা নির্ধারণ, মাঠ পর্যায় হতে নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষাগারে প্রেরণের ক্ষেত্রে কিছুটা সমন্বয় থাকলেও অন্যান্য অংশীজনের বাজার মনিটরিং ও তদারকি কার্যক্রমে সমন্বয়হীনতা ও যোগাযোগের অভাব রয়েছে। এ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মধ্যে একে অপরের ওপর দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়ার মানসিকতা লক্ষণীয়; এর ফলে প্রকৃত অর্থে বাজার পরিদর্শন কার্যক্রম ব্যাহত হয়। এছাড়া মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় জেলা প্রশাসন ও প্রসিকিউটিং এজেন্সিগুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতা ও যোগাযোগের ঘাটতি রয়েছে। অনেকসময় জেলা প্রশাসন হতে নির্দেশনা পাওয়ার পর প্রসিকিউশন কর্মকর্তারা ফিল্ডে হাজির হলেও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ব্যস্ততা বা অনুপস্থিতির কারণে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয় না এবং এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসন অফিস হতে অনেকসময় তাদেরকে সময়মত অবহিত করা হয় না।

৩.২.১৪ খাদ্য স্থাপনা পরিদর্শন ও নমুনা সংগ্রহে অনিয়ম ও দুর্নীতি

নিরাপদ খাদ্যের তদারকি কার্যক্রমে স্যানিটারি ইন্সপেক্টর (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান) এবং ফিল্ড অফিসার (বিএসটিআই) কর্তৃক পরিদর্শন ও খাদ্যপণ্যের নমুনা সংগ্রহে অনিয়ম ও দুর্নীতি লক্ষ করা যায়। গবেষণায় মাঠপর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের স্যানিটারি ইন্সপেক্টররা ক্ষুদ্র খাদ্যপ্রস্তুতকারী ও ভোক্তা পর্যায়ে খুচরা বিক্রেতা পরিদর্শনে আইনি ভয় দেখিয়ে ঘুষ গ্রহণ করে থাকে (ঘুষের পরিমান ২০০-৪০০ টাকা)। আবার মাসিক ভিত্তিতে তারা বড় দোকানদার, রেঁস্তোরা ও বেকারির মালিকের সাথে সমঝোতামূলক দুর্নীতি করে থাকে (মাসিক ঘুষের পরিমান ৫০০-১০০০ টাকা)। কার্যত তদারকি কর্তৃপক্ষের সাথে এ সমঝোতামূলক দুর্নীতির ফলে ভেজাল খাদ্যপ্রস্তুত ও সরবরাহকারী নিয়মিত মাসোহারা দিয়ে তাদের প্রস্তুতকৃত ভেজাল খাদ্যের

বক্স-৫

স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের অনিয়ম ও দুর্নীতি

একজন জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর তার অধীনস্থ ৮টি উপজেলার স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের কাছ থেকে মাসে দুই হাজার টাকা করে উৎকোচ আদায় করেন। মাস শেষে মাসিক সভায় তারা এই উৎকোচ পরিশোধ করে। আবার উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টররা পরিদর্শনকালে বিভিন্ন দোকান হতে মাসিক হারে উৎকোচ আদায় করে। উদাহরণস্বরূপ, গরুর মাংসের দোকান হতে ৭০০ টাকা, ছাগলের মাংসের দোকান হতে ৫০০ টাকা, বেকারি বা বড় দোকান হতে ৭০০ টাকা হতে ১০০০ টাকা পর্যন্ত আদায় করে। এই উৎকোচ নেওয়ার কারণে তারা বিভিন্ন হোটেল, রেস্তোরা এবং দোকানদারদের অনিয়মের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করে না।

---

[৩২] আবুল হাসনাত, বড় মাছে ফরমালিন বেশি, *প্রথম আলো*, ৬ সেপ্টেম্বর ২০১২

[৩৩] ঢাকা শহরের ১০টি বাজার হচ্ছে- মালিবাগবাজার, শান্তিনগর বাজার, মহাখালী বাজার, গুলশান বাজার-২, কাপ্তান বাজার, মোহাম্মদপুর বাজার, উত্তরা সমবায় বাজার, বাদামতরী ফলবাজার, মিরপুর শাহ আরী বাজার ও বনানী। জেলা শহরগুলোর মধ্যে ময়মনসিংহ, মানিকগঞ্জ, রংপুর, লালমনিরহাট, দিনাজপুর, ফরিদপুর, নীলফামারী ও নওঁগা। তথ্য সূত্রঃ এফবিসিসিআই, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪, ঢাকা।

নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা হতে বিরত রাখে। আবার স্যানিটারি ইন্সপেক্টররা খাদ্যপণ্যের নমুনা সংগ্রহে আইনের ভয় দেখিয়ে ব্যক্তিগত সুবিধা গ্রহণ করে। নিয়ম অনুযায়ী মাঠ পর্যায় হতে খাদ্যপণ্যের নমুনা ক্রয় করে পরীক্ষার জন্য প্রেরণের বিধান থাকলেও তারা বিক্রেতা বা সরবরাহকারীদের নিকট হতে নমুনা পরীক্ষার কথা বলে মূল্য প্রদান না করে খাদ্যপণ্য সংগ্রহ করে[৩৪] এবং এরকম সংগৃহীত পণ্য অনেক ক্ষেত্রে পরিদর্শকদের ব্যক্তিগত ভোগ বা ব্যবহার করে থাকে।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বিশেষত ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের পক্ষে অনেক বড় এলাকা তদারকি করা সম্ভব হয় না। এর ফলে কিছুসংখ্যক স্যানিটারি ইন্সপেক্টর নিজ উদ্যোগে সোর্স নিয়োগ দিয়ে থাকেন। তাদের ব্যক্তিগতভাবে নিয়োগকৃত এসব সোর্সদের বেতন ও অন্যান্য সুবিধা প্রদানের খরচও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে নিয়মবহির্ভূত ভাবে আদায় করা হয়।

অপরদিকে বিএসটিআই অধ্যাদেশ অনুযায়ী সিএম লাইসেন্সের আওতাভুক্ত কোম্পানিগুলোর খাদ্যপণ্যের গুনগত মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিএসটিআই কর্তৃক আরোপিত শর্তাবলী অনুযায়ী মান চিহ্ন ব্যাবহার হচ্ছে কিনা এবং নির্দেশিত টেস্টিং কর্মসূচী যথাযথভাবে সম্পাদিত হচ্ছে কি না তা যাচাই করা এবং যে সমস্ত খাদ্যপ্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান সিএম লাইসেন্স গ্রহন/নবায়নের জন্য আবেদন করেছে যে সকল প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনপূর্বক নমুনা সংগ্রহ করা ফিল্ড অফিসারদের অন্যতম দায়িত্ব। কিন্তু মাঠপর্যায়ে বিএসটিআই'র ফিল্ড অফিসাররা খাদ্য কারখানা পরিদর্শন ও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যাচ অনুযায়ী খাদ্যপণ্যের নমুনা সংগ্রহে ঘুষের বিনিময়ে (ছোট বা মাঝারী খাদ্য কারখানা পরিদর্শনের ক্ষেত্রে ঘুষের পরিমান ৫০০০-১০০০০ টাকা কিন্তু বড় বড় কোম্পানিগুলোর ক্ষেত্রে ঘুষের পরিমাণ নিরুপণ করা সম্ভব হয়নি) শিথিলতা প্রদর্শন করেন। এর ফলে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলো অনুমোদিত মানের চেয়ে নিম্নমানের পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাত করে থাকে। উল্লেখ্য, বিএসটিআই কর্তৃক এসকল খাদ্যকারখানা সঠিকভাবে এবং নিয়মিতভাবে পরিদর্শন করা হলে এরকম অনুমোদিত মানের চেয়ে নিম্ন মানের পণ্য সহজেই চিহ্নিত করা যেত।

উল্লেখ্য, উপজেলা, জেলা বা মহানগর পর্যায়ে একটি খাদ্য ব্যবসা, দোকান বা খাদ্য কারখানা পরিদর্শন করতে জড়িত পরিদর্শকরা উপরোক্ত হারে ঘুষ গ্রহণ করেন। সুতরাং তাদের আওতাধীন সকল খাদ্য স্থাপনা থেকে এক মাসে আদায়কৃত মোট ঘুষের পরিমাণ অনেক গুণ বেড়ে যায়।

৩.২.১৫ কাস্টমস হাউজ কর্তৃক আমদানিকৃত খাদ্যপণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও পরিবীক্ষণে অনিয়ম ও সমস্যা

আমদানি নীতি আদেশ (আইপিও) ২০১২-১৫ অনুযায়ী আমদানিকৃত খাদ্যপণ্য খালাসের প্রক্রিয়া হচ্ছে জাহাজ বহির্নোঙ্গর থাকা অবস্থায় খাদ্যপণ্যের স্পেশাল অ্যাপ্রেইজমেন্ট (বিশেষ পরীক্ষা) করা এবং স্পেশাল অ্যাপ্রেইজমেন্টকালীন জেটিতে সকল প্রতিনিধির উপস্থিতি থাকা ও সকলের উপস্থিতিতে নমুনা সংগ্রহ করা। অতঃপর সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষার জন্য পরীক্ষাগারে পাঠানো এবং পরবর্তীতে পরীক্ষাগার কর্তৃক নমুনা পরীক্ষার ফলাফল পূনরায় কাস্টমস হাউজের নমুনা রুমে প্রেরণ করা। নমুনা পরীক্ষার ফলাফল যদি ইতিবাচক হয় তাহলে খাদ্যপণ্য খালাসের অনুমোদন দেওয়া এবং নেতিবাচক রিপোর্ট হলে খাদ্যপণ্য ফেরত পাঠানো বা পুনঃজাহাজীকরণের ব্যবস্থা করা।

আইপিও অনুযায়ী খাদ্যপণ্য খালাসের এই প্রক্রিয়া থাকলেও এটি পালনে কাস্টমস হাউজসহ এ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের অনিয়ম ও সমস্যা লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে দেখা যায়, আইপিও অনুযায়ী জাহাজ বহির্নোঙ্গর থাকা অবস্থায় খাদ্যপণ্যের স্পেশাল অ্যাপ্রেইজমেন্ট করার বিধান থাকলেও তা করা হয় না। এক্ষেত্রে জেটিতে খাদ্যপণ্য খালাসের পর করা হয়। নমুনা সংগ্রহকালীন সকল প্রতিনিধির (কাস্টমস কর্তৃপক্ষ, আমদানিকারকের প্রতিনিধি ও জাহাজের মাষ্টার) উপস্থিতির কথা বলা হলেও তা নিশ্চিত করা হয় না এবং আমদানিকারকের প্রতিনিধি কর্তৃক নমুনা সংগ্রহ করা হয় ও নমুনা সংগ্রহে আদর্শ নমুনায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় না। আবার খাদ্যপণ্যের নমুনা পরীক্ষাগারে প্রেরণের ক্ষেত্রেও অনিয়ম লক্ষ্যণীয়। আইপিও অনুযায়ী কাস্টমস হাউজ সংশ্লিষ্ট পরীক্ষাগারের প্রতিনিধি কর্তৃক নমুনা রুম হতে দিনে দুইবার অর্থাৎ সকাল ও বিকালে নমুনা সংগ্রহ করার বিধান থাকলেও তা করা হয় না এবং এক্ষেত্রে আমদানিকারকের প্রতিনিধি নিজেই নমুনা পরীক্ষাগারে নিয়ে যান এবং নমুনা পরীক্ষার সার্টিফিকেট কাস্টমস হাউজে দাখিল করেন। অপরদিকে আমদানিকারকের প্রতিনিধি কর্তৃক পরীক্ষাগার হতে নমুনা পরীক্ষার সার্টিফিকেট সংগ্রহেও অনিয়ম লক্ষ্য করা যায়। পরীক্ষাগারগুলোর সাথে যোগসাজস করে আমদানিকারকের প্রতিনিধি বেশিরভাগক্ষেত্রে

[৩৪] মাঠ পর্যায়ে খাদ্যপণ্য সংগ্রহে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ থাকে না, অনেক সময় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদেরকে মাঠ পর্যায়ে ম্যানেজের মৌখিক নির্দেশ দিয়ে থাকে।

ঘুষের বিনিময়ে সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে (ঘুষের পরিমান ১০০০-১৫০০টাকা)। আবার নমুনা পরীক্ষার সার্টিফিকেট দাখিলের সময়ও কাস্টমস হাউজ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ঘুষ দিয়ে থাকে (ঘুষের পরিমান ৫০০-৮০০টাকা)।

চিত্র ৩.৪: আমদানিকৃত খাদ্যপণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও পরীবিক্ষণে অনিয়ম ও সমস্যা

৩.২.১৬ ফরমালিনের সহজলভ্যতা ও আমদানির পর্যায়ে তদারকি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণের অভাব

বিভিন্ন শিল্প কারখানা, গবেষণাগার ও হাসপাতালে ফরমালিন ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এসকল জায়গা হতে পঁচনশীল খাদ্যপণ্যের খুচরা ব্যবসায়ীরা কিছু অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীর যোগসাজসে ফরমালিন ক্রয় করে থাকে। আবার দেশের বিভিন্ন সায়িন্টিফিক স্টোরেও ফরমালিন বিক্রয় করা হয়- প্রতি কেজি ৪২৫-৪৫০ টাকা হারে। প্রাপ্তির সহজলভ্যতা ও দামে সস্তা হওয়ায় পচনশীল খাদ্যপণ্যের ব্যবসায়ীরা খাদ্য সংরক্ষণে ফরমালিন ব্যবহার করে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, আমাদের দেশে ফরমালিন আমদানির ক্ষেত্রে এটি শর্তযুক্ত পণ্যের তালিকায় থাকলেও আমদানির পরে এটির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে পরিবীক্ষণ ও তদারকির ব্যবস্থা নেই। ফরমালিন আমদানির অনুমতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের কাগজপত্র যেমন- ট্রেড লাইসেন্স, টিআইএন নম্বর, ভোটার আইডি কার্ড, ব্যবসায়িক সংগঠনের সদস্যের সার্টিফিকেট, ব্যাংক সাটিফিকেট ইত্যাদি জমা দেওয়ার নিয়ম থাকলেও অবৈধভাবে দালাল চক্রের সহায়তায় পাঁচ থেকে সাত হাজার টাকার বিনিময়ে আমদানি-রপ্তানি অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কিছু কর্মকর্তাদের যোগসাজসে ফরমালিন আমদানির সার্টিফিকেট সরবরাহ করে থাকে। আবার এ সকল আমদানিকৃত ফরমালিন কী কাজে ব্যবহার করা হয়েছে বা হচ্ছে তার সঠিক তথ্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জানা নেই। তাছাড়া এ বিষয় তদারকি করার ক্ষেত্রেও তাদের কোনো ব্যবস্থা নেই।

৩.২.১৭ প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমে তদারকির গুরুত্ব কম হওয়া

বর্তমানে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত অংশীজনের বেশিরভাগই নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে প্রতিকারমূলক কার্যক্রমের দায়িত্ব পালন করে থাকে। এর ফলে তাদের কার্যক্রম বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিপণন ও প্রক্রিয়াজাত পর্যায়ে খাদ্য ও খাবারের নমুনা সংগ্রহের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু বৈশ্বিকভাবে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আদর্শ ব্যবস্থা হচ্ছে প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া অর্থাৎ খাদ্যপণ্যের উৎপাদন, পরিবহণ ও সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে তদারকিমূলক কার্যক্রম জোরদার করা। বাংলাদেশে খাদ্য তদারকি ও নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর কার্যক্রম খাদ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে খাবার টেবিল (from farm to table) পর্যন্ত অর্থাৎ সম্পূর্ণ খাদ্য ব্যবস্থাকে (entire food chain) প্রতিফলিত করে না

৩.২.১৮ নিরাপদ খাদ্যের তদারকি কার্যক্রম মহানগরকেন্দ্রিক হওয়া

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ব্যতীত অন্যান্য অংশীজনের (বিএসটিআই, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মৎস্য বিভাগ) নিরাপদ খাদ্যের তদারকি কার্যক্রম বেশিরভাগক্ষেত্রেই মহানগর কেন্দ্রিক সীমাবদ্ধ। উপজেলা বা গ্রাম পর্যায়ে এ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের কার্যক্রম খুব বেশি দৃশ্যমান নয়। এছাড়া খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে মোবাইল কোর্টের কার্যক্রমও প্রায়শ শহর কেন্দ্রিক হয়ে থাকে। অপরদিকে বিএসটিআই ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের নিরাপদ খাদ্যের নজরদারি কার্যক্রমও বিভাগীয় শহরকেন্দ্রিক।

সরকারি প্রতিষ্ঠান ছাড়াও বেসরকারিভাবে বিভিন্ন নাগরিক সংগঠন যেমন- কনজিউমার এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব), পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন (পবা), বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা), স্থানীয় বাজার কমিটি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলো খাদ্যে ভেজাল নিয়ন্ত্রণে জনসচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। এ প্রতিষ্ঠানগুলো নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখলেও স্থানীয় পর্যায়ে তাদের কার্যক্রম অত্যন্ত সীমিত। এক্ষেত্রে তাদের আর্থিক ও লজিস্টিকস সাপোর্টের ঘাটতি রয়েছে।

উপসংহার

বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্যের প্রশাসনিক ও তদারকি কার্যক্রমে বেশ কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগ নিয়োজিত থাকলেও এ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলোর সীমাবদ্ধতা ও কার্যক্রম পরিচালনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ লক্ষণীয়- মাঠপর্যায়ে তদারকি কার্যক্রমে চাহিদা অনুযায়ী জনবলের স্বল্পতা, প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস যেমনঃ পরিদর্শন গাইডলাইন, ম্যানুয়াল, চেকলিস্ট ও যানবাহনের অভাব, মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তাদের মনিটরিং ও জবাবদিহিতার ঘাটতি ও খাদ্যপণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে পরিবীক্ষণ ও দুর্নীতি ইত্যাদি অন্যতম। অপরদিকে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে প্রশাসনিক ও তদারকি কার্যক্রমে বেশ কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগ নিয়োজিত থাকলেও এক্ষেত্রে সমন্বিত একক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অনুপস্থিতির কারণে তাদের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় ও যোগাযোগের ঘাটতি রয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কিছুটা যোগাযোগ ও সমন্বয় থাকলেও অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলোতে বিষয়টি প্রায় অনুপস্থিত রয়েছে। এর ফলে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ ও ভেজাল প্রতিরোধ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের কাজের দ্বৈততা ও অব্যবস্থাপনার সৃষ্টি হয় এবং বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগগুলো দীর্ঘস্থায়ী ও ফলপ্রসূ হয় না।

পরীক্ষাগার ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশে খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ ও পরীক্ষার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার অধীনে বেশ কয়েকটি খাদ্য পরীক্ষাগার আছে। এগুলোর মধ্যে জনস্বাস্থ্য ইন্সটিটিউটের পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরি (পিএইচএল), শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিএসটিআই ফুড ল্যাবরেটরি, ঢাকা সিটি করপোরেশনের পাবলিক হেলথ ফুড ল্যাবরেটরি (পিএইচএফএল), খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় খাদ্য পরীক্ষাগার, বিসিএসআইআর এর ইনস্টিটিউট অব ফুড সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি অন্যতম। এছাড়া সম্প্রতি বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সহায়তায় জনস্বাস্থ্য ইন্সটিটিউটে একটি পরীক্ষাগার স্থাপন করা হয়েছে কিন্তু জনবল নিয়োগ না হওয়ার কারণে পরীক্ষাগারটি এখনো চালু হয় নি। এই গবেষণায় মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষাগারগুলোর কাজের পরিধি ও ক্ষেত্র বিবেচনায় নিম্নোক্ত চারটি ল্যাবরেটরির ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে-

- পিএইচএল, জনস্বাস্থ্য ইন্সটিটিউট
- পিএইচএফএল, ঢাকা সিটি করপোরেশন
- বিএসটিআই
- কাস্টম হাউজ ল্যাবরেটরি

বক্স-৬

"আমাদের দেশে জনগণের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে এমন কোনো সরকারি পরীক্ষাগার নেই যেখানে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি ও যোগ্যতাসম্পন্ন কেমিস্টের উপস্থিতিসহ বিভিন্ন ধরনের খাদ্যদ্রব্যের যেমন, মাছ-মাংস, শাকসজি, ফলমূল ইত্যাদির রুটিন পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। যদি এ ধরণের পরীক্ষাগার থাকত তাহলে তা খাদ্যপণ্যের মান পরীক্ষার ক্ষেত্রে ওয়ানস্টপ সার্ভিসসহ সারাদেশকে সেবা প্রদান করতে পারত"

-একজন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এর মতামত

নিম্নে উল্লেখিত পরীক্ষাগারগুলোর সবল দিক (Strength), দুর্বল দিক (Weaknesses), সম্ভাবনা (Opportunities) এবং প্রয়োজন (Needs) একটি ম্যাট্রিক্স অ্যানালিসিস এর মাধ্যমে দেখানো হল:

<table>
<tr><td rowspan="2">পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরী (পিএইচএল), জনস্বাস্থ্য ইন্সটিটিউট</td><td>সবল দিক (Strength)
• বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশের মাধ্যমে আইনি স্বীকৃতি
• খাদ্যের নমুনা সংগ্রহে স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের মাধ্যমে দেশব্যাপি নেটওয়ার্ক</td><td>দুর্বল দিক (Weaknesses)
• কাজের চাপ অনুযায়ী জনবলের স্বল্পতা এবং দক্ষ ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনবলের অভাব
• প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাব
• দুর্বল জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত নীতিমালা
• পরীক্ষিত দ্রব্যাদির ক্রস চেকিং এর ব্যবস্থা না থাকা
• অপর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ</td></tr>
<tr><td>সম্ভাবনা (Opportunities)
• সম্প্রতি বিশ্ব খাদ্য সংস্থার সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত 'ন্যাশনাল ফুড সেফটি ল্যাবরেটরি' এর মাধ্যমে টেকনিক্যাল সাপোর্ট প্রদানের উদ্যোগ গৃহীত হলে এটি নিরাপদ খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণে কাঙ্খিত ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে।</td><td>প্রয়োজন (Needs)
• প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ ও যোগ্যতা সম্পন্ন কেমিস্ট ও মাইক্রোবায়োলজিস্ট নিয়োগ
• জনবলের দক্ষতার উন্নয়ন বিশেষত: কেমিক্যাল ও মাইক্রোবায়াল পরীক্ষার ওপর প্রশিক্ষণ
• প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ
• পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ</td></tr>
<tr><td>বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই)</td><td>সবল দিক (Strength)
• বিএসটিআই অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে আইনি ভিত্তি ও স্বায়ত্বশাসন
• কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগারটিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও যোগ্যতা সম্পন্ন জনবল</td><td>দুর্বল দিক (Weaknesses)
• বিভাগীয় পর্যায়ের ল্যাবরেটরিতে কাজের চাপের তুলনায় অপর্যাপ্ত জনবল
• বিভাগীয় পরীক্ষাগারে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ও প্রশিক্ষিত জনবলের অভাব</td></tr>
</table>

	• কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগারটি প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সম্পন্ন • প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা ও সমর্থন	• খাদ্যপণ্যের পরীক্ষা শুধুমাত্র ৫৮টি খাদ্য আইটেমের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা
	সম্ভাবনা (Opportunities) • প্রাতিষ্ঠানিক ঐতিহ্য ও সুনাম • কারিগরী দক্ষতা • বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সমন্বয় এবং পরীক্ষিত দ্রব্যের ক্রস চেকিং এর সুযোগ	**প্রয়োজন (Needs)** • দেশের সকল বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে ল্যাবরেটরি স্থাপন করা প্রয়োজন। • বিদ্যমান বিভাগীয় পরীক্ষাগারগুলোতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও জনবল নিয়োগ • খাদ্যে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকারক কেমিক্যাল ও প্রিজারভেটিভ এর ওপর উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। • জনবলের দক্ষতার উন্নয়নে প্রশিক্ষণ
পাবলিক হেলথ ফুড ল্যাবরেটরি, ঢাকা সিটি কর্পোরেশন	**সবল দিক (Strength)** • খাদ্যের নমুনা সংগ্রহে সিটি কর্পোরেশনের স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের নেটওয়ার্ক • সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসকের সহায়তা	**দুর্বল দিক (Weaknesses)** • জনবলের স্বল্পতা • দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবলের অভাব • খাদ্যের মান পরীক্ষায় প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাব
	সম্ভাবনা (Opportunities) • এডিবি'র আর্থিক সহায়তায় প্রয়োজনীয় সরঞ্জামপূর্ণ পরীক্ষাগার স্থাপনের পরিকল্পনা	**প্রয়োজন (Needs)** • জনবল বৃদ্ধি • প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ • দক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন কেমিস্ট ও মাইক্রোবায়োলজিস্ট • খাদ্যে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকারক কেমিক্যাল ও প্রিজারভেটিভ এর ওপর উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। • পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ প্রয়োজন
কাস্টম হাউজ ল্যাবরেটরি (চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর ও বেনাপোল স্থলবন্দর)	**সবল দিক (Strength)** • কাস্টমস অ্যাক্ট অনুযায়ী আমদানিকৃত খাদ্যপণ্যের নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষার ক্ষেত্রে আইনি ভিত্তি • কাস্টমস ও বন্দর কর্তৃপক্ষের তদারকি	**দুর্বল দিক (Weaknesses)** • জনবল স্বল্পতা • দক্ষ ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনবলের অভাব • বেনাপোল কাস্টমস হাউজ পরীক্ষাগার চালু না হওয়া • খাদ্যের মান পরীক্ষায় প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাব
	সম্ভাবনা (Opportunities) • ল্যাবরেটরি দু'টির সক্ষমতা বৃদ্ধি করলে আমদানিকৃত খাদ্যপণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হবে এবং অন্যান্য পরীক্ষাগারের ওপর চাপ কমবে	**প্রয়োজন (Needs)** • জনবল নিয়োগ ও বৃদ্ধি করা • জনবলের দক্ষতার উন্নয়নে প্রশিক্ষণ • প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ

৪.১ পরীক্ষাগার ব্যবস্থাপনায় সীমাবদ্ধতা ও সুশাসনের ঘাটতি

৪.১.১ কাজের চাপ অনুযায়ী জনবলের অভাব

খাদ্যপণ্যের মান পরীক্ষার ক্ষেত্রে কাজের চাপ অনুযায়ী প্রতিটি পরীক্ষাগারেই প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব রয়েছে। জনস্বাস্থ্য ইন্সটিটিউটের পিএইচএল'র পরীক্ষাগারের সর্বমোট অনুমোদিত পদ হচ্ছে ৩৪টি যা ১৯৫৩ সালে পরীক্ষাগারটির প্রতিষ্ঠাকালীন প্রণয়ন করা হয়েছিল। এরমধ্যে পরীক্ষাগারের মৌলিক পদ হচ্ছে নয়টি (একজন পাবলিক অ্যানালিস্ট, দুইজন প্রধান সহকারী এবং ছয়জন ল্যাব সহকারী)। এ পরীক্ষাগারে প্রতিমাসে দেশের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা হতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের পাঠানো প্রায় ৭০০-৮০০ এর মতো নমুনা জমা হয় কিন্তু জনবলের অপ্রতুলতার কারণে ৩০০-৪০০ নমুনা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরীক্ষা করা সম্ভব হয়[৩৫]। অপরদিকে বিএসটিআই'র ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগারটি প্রয়োজনীয় জনবলসম্পন্ন হলেও বিভাগীয় পর্যায়ের পরীক্ষাগারগুলোতে জনবল সংকট রয়েছে। এরফলে স্থানীয় পর্যায়ে প্রাপ্ত নমুনার একটি বড় অংশ তারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরীক্ষা করতে পারে না। উদাহরস্বরূপ- চট্টগ্রামের বিএসটিআই'র পরীক্ষাগারে শুধুমাত্র

[৩৫] জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরি, ঢাকা

খাদ্যপণ্য পরীক্ষার জন্য প্রতিমাসে প্রায় ৫০০টির বেশি নমুনা জমা হয় কিন্তু জনবল সংকটের কারণে তারা ১৫০টির বেশি নমুনা পরীক্ষা করতে পারে না[৩৬]। আবার ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের খাদ্য পরীক্ষাগারটিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সংক্রান্ত কাজে মাত্র তিনজন জনবল রয়েছে। এর মধ্যে পরীক্ষাগারের প্রধান হিসেবে একজন 'পাবলিক অ্যানালিস্ট' ও দুইজন 'ল্যাব সহকারী' কর্মরত আছে।

৪.১.২ পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাব

বিএসটিআই'র ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগার ব্যতিত প্রতিটি পরীক্ষাগারেই(পিএইচএল, পিএইচএফএল, কাস্টমস হাউজ ল্যাবরেটরি) পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাব রয়েছে। বিএসটিআই'র বিভাগীয় পর্যায়ে ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগারসহ মোট ছয়টি পরীক্ষাগার আছে। কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগারটি বিশেষায়িত যন্ত্রপাতিসহ খাদ্যপণ্যের প্রয়োজনীয় সব ধরনের প্যারামিটারের ওপর পরীক্ষা করতে সক্ষম হলেও পর্যবেক্ষণে দেখা যায় ঢাকা ব্যতিত বিভাগীয় পর্যায়ের পরীক্ষাগারগুলোতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাবে বিএসটিআই'র আওতাভুক্ত সবগুলো খাদ্যপণ্যের মান পরীক্ষা করা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে তারা নমুনা ঢাকার কেন্দ্রিয় পরীক্ষাগারে প্রেরণ করে।

অপরদিকে জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের খাদ্য পরীক্ষাগারের অবকাঠামো ব্যবস্থা ও কাজের পরিবেশ সন্তোষজনক নয়। গবেষণায় পর্যবেক্ষণে দেখা যায় এই তিনটি ল্যাবরেটরিতেই প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও রিএজেন্টস এর অভাব রয়েছে। এখানে শুধু খাদ্যপণ্যের সাধারণ পরীক্ষাসমূহ করা সম্ভব হয় অর্থাৎ খাদ্যপণ্যটি ভেজাল অথবা ভেজালমুক্ত এটি জানা সম্ভব হয় কিন্তু খাদ্যপণ্যে নিয়মিতভাবে কেমিক্যাল ও মাইক্রোবায়োলজিক্যাল টক্সিন এর উপস্থিতি পরীক্ষা করা সম্ভব হয় না।

৪.১.৩ বন্দরগুলোতে পরীক্ষাগারের সক্ষমতার ঘাটতি ও পরীক্ষাগার সচল না থাকা

দেশে আমদানিকৃত খাদ্যজাত দ্রব্যের শতকরা ৮০ ভাগ চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর ও বেনাপোল স্থল বন্দরের মাধ্যমে প্রবেশ করে[৩৭]। আমদানিকৃত খাদ্যপণ্যের মান পরীক্ষার জন্য চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউজ ও বেনাপোল কাসটমস হাউজের অধীনে দু'টি পরীক্ষাগার আছে। চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউজের পরীক্ষাগারটিতে খাদ্যপণ্য পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস সাপোর্টসহ পরীক্ষাগারে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবলের অভাব রয়েছে। অপরদিকে বেনাপোল স্থলবন্দরে খাদ্যপণ্য পরীক্ষার জন্য বর্তমানে কাস্টমস হাউজের পরীক্ষাগারটি চালু নেই। উল্লেখ্য যে ২০১০ সালে এ বন্দরে একটি গবেষণাগার ভবন নির্মাণ করা হয়েছে কিন্তু প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও জনবল নিয়োগ করা হয় নি। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় বর্তমানে ভবনটি কাস্টমস হাউজের অফিস কক্ষ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

৪.১.৪ পরীক্ষাগারগুলোতে টেকনিক্যাল স্টাফদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের ঘাটতি

বিএসটিআই ব্যতীত অন্যান্য তিনটি পরীক্ষাগারেই ল্যাব টেকনিশিয়ানদের জন্য নিয়মিত কোনো ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা চালু নেই। এছাড়া তাদের মধ্যে খাদ্যপণ্যের মান পরীক্ষার বিভিন্ন সমসাময়িক চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে। এর ফলে অনেকসময় তারা তাদের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনায় সমস্যার সম্মুখীন হন। তবে জুনিয়র টেকনিশিয়ানরা সিনিয়র টেকনিশিয়ানদের অভিজ্ঞতার আলোকে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ ও কারিগরি সমস্যার সমাধান করে থাকে।

৪.১.৫ টেকনিক্যাল পদগুলোতে বিষয় সংশ্লিষ্ট শিক্ষাগত যোগ্যতা বিবেচনা না করা

বিএসটিআই ব্যতিত অন্যান্য তিনটি পরীক্ষাগারে টেকনিক্যাল পদগুলোতে জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পদভিত্তিক শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয়টি বিবেচনা করা হয় না। উদাহরণস্বরূপ- নমুনা পরীক্ষার জন্য জনস্বাস্থ্য ল্যাবরেটরির মৌলিক দুটি পদ হচ্ছে যথাক্রমে এ্যাসিস্টেন্ট এনালিস্ট ও মেডিকেল টেকনোলোজিস্ট (ল্যাবরেটরি)। এই পদ দুটির জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা হচ্ছে সায়েন্স গ্রাজুয়েট বা হেলথ টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা। এখানে নির্দিষ্ট বিষয় হিসেবে কেমিস্ট্রি বা এ সংশ্লিষ্ট বিষয়কে বিবেচনা করা হয়নি। এর ফলে সায়েন্সের অন্যান্য বিষয়গুলো হতে নিয়োগপ্রাপ্তদের বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল অ্যানালিসিস বা ল্যাবরেটরি কারিগরী বিষয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণা থাকে না। ফলে নিয়োগ পরবর্তীতে তাদের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হয় না।

৪.১.৬ খাদ্যের নমুনা পরীক্ষার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা ও আন্তঃপরীক্ষাগার ক্রস চেকিং ব্যবস্থার অনুপস্থিতি

বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে স্যানিটারি ইন্সপেক্টর কর্তৃক প্রেরিত নমুনা জনস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের পরীক্ষাগারে পাঠানোর সাত দিনের মধ্যে সনদ প্রদানের বিধান রয়েছে। কিন্তু পরীক্ষাগারে প্রয়োজনীয় জনবল স্বল্পতার কারণে মাঠ পর্যায়

[৩৬] বিএসটিআই আঞ্চলিক অফিস, চট্টগ্রাম

[৩৭] কাস্টমস হাউজ, চট্টগ্রাম

হতে প্রেরিত নমুনা পরীক্ষার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা রয়েছে। সঠিক সময়ে নমুনা পরীক্ষার ফলাফল না পাওয়ার কারণে তারা ভেজালকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে না। অপরদিকে পরীক্ষাগারগুলোতে পরীক্ষিত দ্রব্যের সঠিকতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিরুপনের জন্য আন্ত:পরীক্ষাগার ক্রস চেকিং এর এর ব্যবস্থা নেই। এর ফলে পরীক্ষাগারগুলোর দক্ষতা ও পরীক্ষিত দ্রব্যের সঠিকতা নিরুপণ করা সম্ভব হয় না। উল্লেখ্য, শুধুমাত্র বিএসটিআই এর কেন্দ্রীয় ল্যারেটরিতে ক্রসচেকিং এর ব্যবস্থা আছে।

৪.১.৭ খাদ্যপণ্যের নমুনা পরীক্ষায় অনিয়ম ও দুর্নীতি

পরীক্ষাগারগুলোতে খাদ্যপণ্যের নমুনা পরীক্ষায় অনিয়ম ও দুর্নীতির যোগসাজস লক্ষ্য করা যায়। যেহেতু পরীক্ষাগারগুলোতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল ও সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে, তাই পরীক্ষাগার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা অনেক সময় নমুনা পরীক্ষা না করে ব্যক্তিগত সুবিধার বিনিময়ে (ঘুষ, উপঢৌকন ইত্যাদি) সনদ প্রদান করে থাকে। এক্ষেত্রে পরীক্ষাগারগুলোর পাবলিক এনালিস্ট পরীক্ষিত দ্রব্যের পয়েন্ট কমিয়ে বা বাড়িয়ে পণ্যের গুণগত মানের সার্টিফিকেট প্রদান করে থাকে। আবার বিএসটিআই কর্তৃক শিল্পজাত খাদ্যপণ্যের মান পরীক্ষার ক্ষেত্রেও অনিয়ম ও দুর্নীতি রয়েছে। এক্ষেত্রে পরীক্ষাগার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা সংশ্লিষ্ট ফিল্ড অফিসার ও কোম্পানিগুলোর মধ্যে সমঝোতামূলক (win-win game) দুর্নীতি সংগঠিত হয়ে থাকে। অপরদিকে মাঠপর্যায়ে কর্মরত স্যানিটারি ইন্সপেক্টরাও নমুনা পরীক্ষায় দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি করে থাকে। তারা খাদ্য ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে নমুনা সংগ্রহ করে যদি নেতিবাচক রিপোর্ট আসে তাহলে মামলা করার ভয়ভীতি দেখিয়ে ঘুষ আদায় করে থাকে এবং পরবর্তীতে পরীক্ষাগার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে যোগসাজসে নেতিবাচক রিপোর্টকে ইতিবাচক হিসেবে সংগ্রহ করে।

উপসংহার

সুতারাং সার্বিকভাবে বলা যায় যে, মাঠ পর্যায়ে খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণে উপরোল্লিখিত পরীক্ষাগারগুলোর জনগুরুত্ব বিবেচনায় প্রত্যাশিতভাবে ভূমিকা পালন করতে পারছে না। এর কারণ হিসেবে পরীক্ষাগারগুলোর বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা যেমন- কাজের চাপ অনুযায়ী জনবলের অভাব, পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাব, টেকনিক্যাল স্টাফদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের ঘাটতি, টেকনিক্যাল পদগুলোতে বিষয় সংশ্লিষ্ট শিক্ষাগত যোগ্যতা বিবেচনা না করা, খাদ্যের নমুনা পরীক্ষার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা ও আন্তঃপরীক্ষাগার ক্রস চেকিং ব্যবস্থার অনুপস্থিতি, পরীক্ষাগারগুলোর মধ্যে প্রযুক্তিলব্ধ তথ্য ও জ্ঞান বিনিময়ের ক্ষেত্রে সমন্বয়ের অভাব এবং খাদ্যপণ্যের নমুনা পরীক্ষায় অনিয়ম ও দুর্নীতি ইত্যাদি উল্লেখ করা যেতে পারে। এ সকল সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা থেকে উত্তরণের জন্য অতিসত্তর এসকল পরীক্ষাগারগুলোতে প্রয়োজনীয় জনবল, অবকাঠামো, যন্ত্রপাতিসহ যোগ্যতাসম্পন্ন কেমিস্টের উপস্থিতি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এছাড়া পরীক্ষাগারগুলোতে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও মন্ত্রণালয়কে আরো বেশি তৎপর হওয়া প্রয়োজন।

পঞ্চম অধ্যায়
উপসংহার ও সুপারিশ

বাংলাদেশে খাদ্য তদারকি ও নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর কার্যক্রম খাদ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে খাবার টেবিল (from farm to table) পর্যন্ত অর্থাৎ সম্পূর্ণ খাদ্য ব্যবস্থাকে (entire food chain) প্রতিফলিত করে না। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত অংশীজনের বেশিরভাগই নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে প্রতিকারমূলক কার্যক্রমের দায়িত্ব পালন করে থাকে। এর ফলে তাদের কার্যক্রম বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রক্রিয়াজাত খাদ্য ও খাবারের নমুনা সংগ্রহের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে । এ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্যের প্রশাসনিক ও তদারকি কার্যক্রমে সরকারের বেশ কয়েকটি মন্ত্রণালয় ও এ সংশ্লিষ্ট বিভাগ নিয়োজিত থাকলেও এ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধতা ও সুশাসনের ঘাটতি রয়েছে। সুশাসনের ঘাটতির কারণ হিসেবে প্রতিষ্ঠানগুলোর মাঠ পর্যায়ের তদারকি কার্যক্রমে চাহিদা অনুযায়ী জনবলের স্বল্পতা, নিরাপদ খাদ্যের তদারকিতে সুনির্দিষ্ট বা পৃথকভাবে পদ না থাকা, স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের পদমর্যাদায় ঘাটতি, নিরাপদ খাদ্যের বিধান লঙ্ঘনজণিত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণে প্রভাব বিস্তার, খাদ্য তদারকির ক্ষেত্রে বিভিন্ন নীতিমালা (পরিদর্শন গাইডলাইন ও ম্যানুয়াল, চেকলিস্ট ইত্যাদি) ও প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস (খাদ্য পরীক্ষার বিভিন্ন টুল কিটস, যানবাহন ইত্যাদি) এর অভাব, মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শকদের অভ্যন্তরীণ মনিটরিং ও জবাবদিহিতার ঘাটতি, খাদ্য তদারকি কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের ঘাটতি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া এছাড়া নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে প্রশাসনিক ও তদারকি কার্যক্রমে বেশ কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগ নিয়োজিত থাকলেও এক্ষেত্রে সমন্বিত একক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অনুপস্থিতির কারণে তাদের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় ও যোগাযোগের ঘাটতি রয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কিছুটা যোগাযোগ ও সমন্বয় থাকলেও অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলোতে বিষয়টি প্রায় অনুপস্থিত রয়েছে। আবার তদারকি প্রতিষ্ঠানগুলোর মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মনিটরিং ও জবাবদিহিতার ঘাটতির কারণে তারা অনেকসময় খাদ্য তদারকির মৌলিক কাজটিকে গৌণ দায়িত্ব হিসেবে মনে করে এবং পরিবীক্ষণ ও তদারকি কার্যক্রমে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতি করে থাকে। এ সকল সীমাবদ্ধতা ও সুশাসনের ঘাটতির ফলে মাঠ পর্যায়ে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ ও ভেজাল প্রতিরোধ কার্যক্রমে দ্বৈততা ও অব্যবস্থাপনার সৃষ্টি হয় এবং বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগগুলো দীর্ঘস্থায়ী ও ফলপ্রসু হয় না।

অপরদিকে খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণে এ গবেষণার আওতাভুক্ত পরীক্ষাগারগুলো তাদের কাজের পরিধি ও গুরুত্ব বিবেচনায় প্রত্যাশিতভাবে ভূমিকা পালন করতে পারছে না। এর কারণ হিসেবে পরীক্ষাগারগুলোর বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা ও সুশাসনগত ব্যত্যয় লক্ষ্যণীয়, যেমন- পরীক্ষাগারগুলোতে কাজের চাপ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় জনবলের অভাব, পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাব, টেকনিক্যাল স্টাফদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের ঘাটতি, টেকনিক্যাল পদগুলোতে বিষয় সংশ্লিষ্ট শিক্ষাগত যোগ্যতা বিবেচনা না করা, খাদ্যের নমুনা পরীক্ষার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা ও আন্তঃপরীক্ষাগার ক্রস চেকিং ব্যবস্থার অনুপস্থিতি, পরীক্ষাগারগুলোর মধ্যে প্রযুক্তিলব্ধ তথ্য ও জ্ঞান বিনিময়ের ক্ষেত্রে সমন্বয়ের অভাব এবং খাদ্যপণ্যের নমুনা পরীক্ষায় অনিয়ম ও দুর্নীতি উল্লেখযোগ্য।

আবার বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ তথা খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে গবেষণায় উল্লেখিত আইন তিনটির- বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ (সংশোধিত ২০০৫), নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯) ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য থাকলেও এগুলোর কিছু সীমাবদ্ধতা ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ লক্ষণীয়। এগুলো হলো- বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ ও ভোক্তা সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এ ভোক্তাদের সরাসরি মামলা দায়ের করার বিধান না থাকা, নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এ সরাসরি মামলা করার বিধান থাকলেও এক্ষেত্রে ৩০ দিনের বাধ্যবাধকতা থাকা, ভোক্তা বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি কর্তৃক ক্রুটিপূর্ণ নমুনা পরীক্ষার ফি জমাদানের বাধ্যবাধকতা, ভোক্তার অভিযোগ নিরসনে প্রক্রিয়াগত জটিলতা, জেলা ও মহানগর পর্যায়ে খাদ্য আদালত গঠিত না হওয়া, বিদ্যমান আইনে কঠোর দণ্ডের অভাব এবং আদালতে মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রতা ও অভিযুক্ত কোম্পানি কর্তৃক নিম্নমানের খাদ্যপণ্য উৎপাদন অব্যহত থাকা উল্লেখযোগ্য। অপরদিকে বিশুদ্ধ খাদ্য বিধি, ১৯৬৭'তে স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের খাদ্যপণ্যের নমুনা সংগ্রহ কার্যক্রম ১০৭টি খাদ্য আইটেমের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। এর ফলে অনেক খাদ্যপণ্য পরিদর্শনের বাইরে থেকে যায়। আইনের এ সকল সীমাবদ্ধতা ও বাস্তবায়ন পর্যায়ে চ্যালেঞ্জের কারণে আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এসব আইনের সুফল পায় না এবং সার্বিকভাবে নিরাপদ খাদ্যের আইনি প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হয়। উপরন্তু আইনি এ সকল সীমাবদ্ধতার কারণে মাঠ পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও খাদ্যে ভেজালকারীরা নানাবিধ অনিয়ম ও দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণের সুযোগ পায়।

নিম্নে এ গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বাংলাদেশে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে সুশাসনের ঘাটতির কারণ, এর ফলাফল ও প্রভাব একটি ফ্লো-চার্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল:

চিত্র ৫.১: সুশাসনের ঘাটতির কারণ, ফলাফল ও প্রভাব

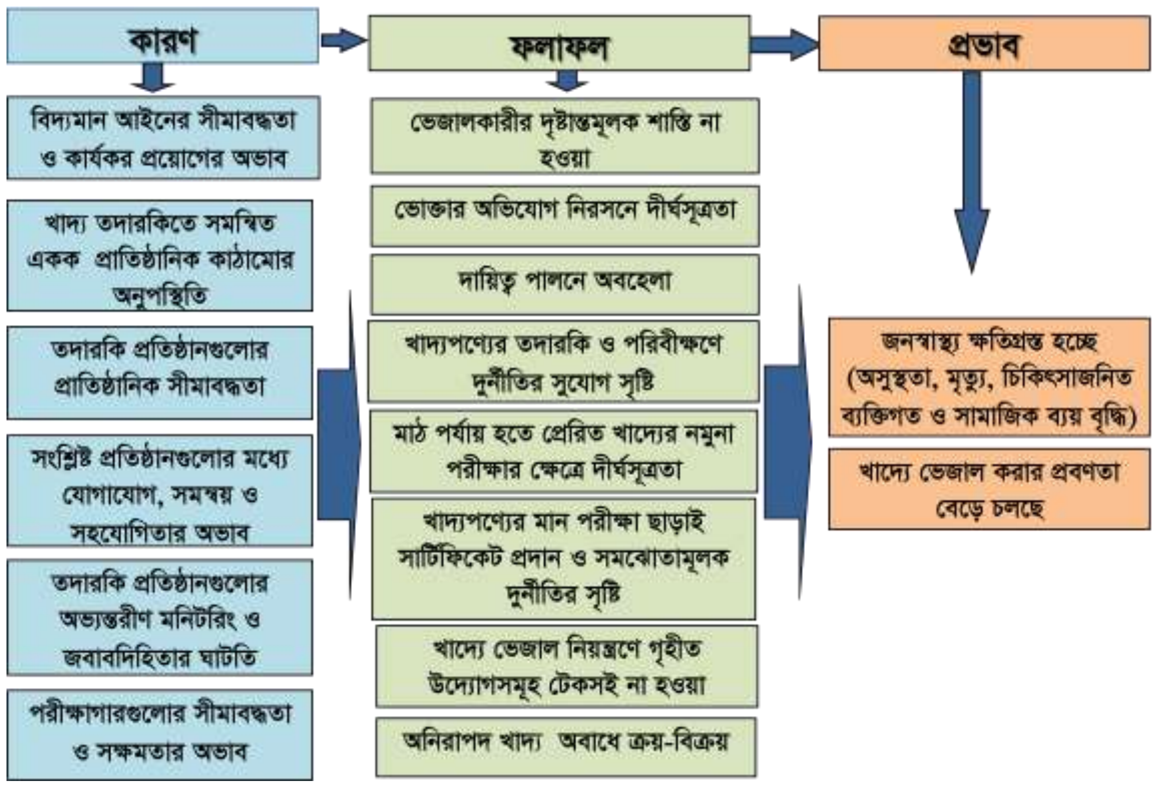

৫.১ সুপারিশ

এই গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে প্রশাসনিক ও তদারকি ব্যবস্থাপনাকে আরো উন্নত, টেকসই করা এবং দুর্নীতি ও অনিয়মরোধে নিম্নোক্ত সুপারিশ প্রণয়ন করা হচ্ছে:

আইনি কাঠামো সংক্রান্ত

১. নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এ নিম্নোক্ত সংশোধনী এনে তা দ্রুত বলবৎ করতে হবে-
   - প্রতিটি জেলা ও মহানগরে এক বা একাধিক খাদ্য আদালত গঠন
   - ভোক্তা কর্তৃক মামলা করার সময়সীমা ৩০ দিনের পরিবর্তে ৯০ দিন করা
   - ভোক্তা কর্তৃক নমুনা পরীক্ষার ব্যয়ভার রহিত করে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষকে বহনের বিধান করা
   - সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান রাখা

২. ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে-
   - ভোক্তার সরাসরি মামলা করার অধিকার প্রতিষ্ঠা
   - বাজার পরিদর্শন ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় ম্যাজিস্টেট, প্রসিকিউটিং এজেন্সি ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তা প্রদানে বাধ্যবাধকতা রাখা

৩. নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন বা সংশোধনী আনতে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজন যেমন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, বিএসটিআই এর কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সুশীল সমাজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

৪. খাদ্যে ভেজাল মেশানোর অপরাধে কঠোরভাবে আইন প্রয়োগ ও যথোপযুক্ত শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

প্রশাসন ও তদারকি ব্যবস্থা সম্পর্কিত

৫. নিরাপদ খাদ্যের প্রশাসনিক তদারকির জন্য নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ এর বিধান অনুযায়ী অতিসত্ত্বর 'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ' গঠন করতে হবে।

৬. পরিদর্শকদের কাজের পরিধি ও ভৌগোলিক আওতা বিবেচনায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, বিএসটিআই ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ও ফিল্ড অফিসার নিয়োগ দিতে হবে এবং বিদ্যমান ফাঁকা পদগুলো অতিসত্ত্বর পূরণ করতে হবে।

৭. স্থানীয় সরকার ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্তদের পদটি কমপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদা সম্পন্ন করতে হবে।

৮. খাদ্যে ভেজালরোধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুলিশ সদস্য নিশ্চিত করতে হবে এবং মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় পুলিশ ও প্রশাসনের সাথে সমন্বয় বৃদ্ধি করতে হবে।

৯. খাদ্য তদারকি সংক্রান্ত মামলা পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট অংশীজনের নিজস্ব বা চুক্তিভিত্তিক আইনজীবী নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

১০. স্থানীয় পর্যায়ে খাদ্য পরিদর্শণ কাজে গতি আনতে স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের জন্য আলাদা বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে।

১১. স্যানিটারি ইন্সপেক্টরদের মাঠ পর্যায়ে খাদ্য তদারকির ক্ষেত্রে অভিন্ন পরিদর্শন ম্যানুয়ালসহ খাদ্যের নমুনা সংগ্রহ ও পরিদর্শনের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে হবে।

১২. জেলাপর্যায়ে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটির কার্যক্রমকে বেগবান করতে হবে এবং আইনে উল্লেখিত বিধান অনুযায়ী উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কমিটি গঠন করতে হবে।

১৩. মাঠপর্যায়ে নিরাপদ খাদ্যের তদারকিতে অনিয়ম ও দুর্নীতিরোধে কর্মরত পরিদর্শকদের (স্যানিটারি ইন্সপেক্টর, ফিল্ড অফিসার, খাদ্য পরিদর্শক) জন্য নৈতিক আচরণবিধি তৈরি ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

১৪. মাঠ পর্যায়ে নিরাপদ খাদ্যের তদারকিতে প্রশাসন ও তদারকি সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে অন্যান্য অংশীজনের (যেমন - সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দ, ব্যাবসায়ী প্রতিনিধি, সাংবাদিক) অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

পরীক্ষাগার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত

১৫. খাদ্য পরীক্ষাগারগুলোকে আধুনিকায়নের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ জনবল নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। 'ন্যাশনাল ফুড সেফটি ল্যাবরেটরি' ও বেনাপোল স্থলবন্দরের পরীক্ষাগারটিতে জনবল নিয়োগ দিয়ে দ্রুত চালু করতে হবে।

১৬. খাদ্য পরীক্ষাগারগুলোর মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ, পারস্পরিক সম্পর্ক, তথ্য আদান-প্রদান ও সমন্বয় সাধন নিশ্চিত করতে হবে।

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থপাঞ্জি

১. স্বাস্থ্য অধিদপ্তর (২০১২), *হেলথ বুলেটিন ২০১২:* স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

২. এফএও (২০১০), *রিভিউ অব দি ফুড সেফটি অ্যান্ড কোয়ালিটি রিলেটেড পলিসিস ইন বাংলাদেশ:* আইপিএইচ, মহাখালি, ঢাকা।

৩. এফএও (২০১০), *অ্যাসেসমেন্ট অব দি ক্যাপাবিলিটিজ অ্যান্ড ক্যাপাসিটিজ অব ফুড ল্যাবরেটরিজ ইন বাংলাদেশ:* আইপিএইচ, মহাখালি, ঢাকা।

৪. খান, ন.ই. (২০১২), *ফুড অ্যাডালটারেশন: এ রিভিউ অব দি প্রিভেইলিং লেজিসলেশন্স*: দি ঢাকা কুরিয়ার, ঢাকা।

৫. এফএও (২০১০), *ফুড ইন্সপেকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট ইন বাংলাদেশ:* আইপিএইচ, মহাখালি, ঢাকা।

৬. আতাহার আলী, ম. আ. ই.(২০১৩) 'ফুড সেফটি অ্যান্ড পাবলিক হেলথ ইস্যুস ইন বাংলাদেশ: এ রেগুলেটরি', রিসার্চ অনলাইন, ফ্যাকাল্টি অব ল, হিউম্যানিটিজ অ্যান্ড আর্টস, ইউনিভার্সিটি অব অলনগং

৭. আলম, ম.আ. (২০১২) *নিড ফর ফুড টেস্টিং অ্যান্ড ফুড টেস্টিং ল্যাবরেটরিজ ইন বাংলাদেশ*: দি ফাইন্যানশিয়াল এক্সপ্রেস, ঢাকা।

৮. বিশ্বাস, অ.ক.(২০১২) *ফুড কন্টামিনেশন নিডস টুবি অ্যাড্রেসড ইমিডিয়েটলি*: দি ডেইলি স্টার, ঢাকা।

৯. হোসেন, ম.(২০০৮) *ফুড সেফটি অ্যান্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল ইন বাংলাদেশ*: দি ফাইন্যানশিয়াল এক্সপ্রেস, সেপ্টেম্বর ১০, ২০০৮ ঢাকা।

১০. জাতীয় খাদ্য নীতি, ২০০৬।

১১. জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি, ২০১১।

১২. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (২০০০)।

১৩. বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ (ইস্ট পাকিস্তান অর্ডিন্যান্স নং LXVIII অব ১৯৫৯)।

১৪. নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ৪৩ নং আইন)।

১৫. ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সালের ২৬ নং আইন)।

১৬. অ্যাসিউরিং ফুড সেফটি অ্যান্ড কোয়ালিটি: গাইডলাইনস ফর স্ট্রেন্থদিং ন্যাশনাল ফুড কন্ট্রোল সিস্টেম, এফএও অ্যান্ড ডব্লিউ এইচও.www.who.int/foodsafety/publications/fs_management/guidelines_foodcontrol/en/

পরিশিষ্ট-১: জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ও উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টরের দায়-দায়িত্ব

জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর:

- ডেপুটি সিভিল সার্জনের সরাসরি তত্ত্বাবধায়নে কাজ করতে হবে, যদি ডেপুটি সিভিল সার্জন না থাকে তবে সিভিল সার্জনের তত্ত্বধায়নে কাজ করতে হবে
- উপজেলা স্যানিটরী ইন্সপেক্টরদের কাজ তদারক করা এবং তারা তাদের দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করছেন কিনা সেটা নিশ্চিত করা
- কোন মহামারীর পরিপ্রেক্ষিতে সিভিল সার্জন/ ডেপুটি সিভিল সার্জন কর্তৃক গঠিত সার্ভিলেন্স দলে সদস্য হিসেবে কাজ করা এবং মহামারী সৃষ্টিকারী রোগ সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধানের পর রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রস্তাব পেশ করা।
- মাঠ কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
- মাঠকর্মী, সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক ও স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের কর্মদক্ষতা পরিদর্শণ করা
- তত্ত্বাবধায়ক কর্মকর্তা কর্তৃক অর্পিত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন

উপজেলা স্যানিটারী ইন্সপেক্টর:

- উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার সরাসরি তত্ত্বাবধায়নে কাজ করবেন এবং সকল কাজের জন্য উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কাছে দায়ী থাকবেন
- প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কর্মসূচীর ভিত্তিতে প্রনীত সরকারের বর্তমান স্বাস্থ্য নীতিসম্পর্কে এবং সংগঠন ও প্রশাসনিক কাঠামো সম্বন্ধে সম্পূর্নরূপে ওয়াকেবহাল থাকতে হবে
- বর্তমানে প্রচলিত এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে প্রনীত সরকারের বর্তমান স্বাস্থ্য নীতি সম্পর্কে এবং সংগঠন ও প্রশাসনিক কাঠামো সম্বন্ধে সম্পূর্নরূপে ওয়াকেবহাল থাকতে হবে
- উপজেলাতে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক আইন ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ এবং স্থানীয় আদালতে এই সকল মোকদ্দমার কার্য পরিচালনার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধিত্ব করা
- উপজেলা জনস্বাস্থ্য বিষয়ক আইন অনুযায়ী রেকর্ড সংরক্ষণ করা এবং এই ধরনের কাজের ওপর যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহা-পরিচালকের কাছে মাসিক প্রতিবেদন দাখিল করা। এই সম্বন্ধে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আইন বিভাগের নির্দেশ গ্রহন করা
- উপজেলা জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বা ক্ষতিকর হতে পারে এরূপ বিষয় সম্বন্ধে অবহিত থাকা। উল্লেখ থাকে যে তিনি নির্ধারিত সময়ের ব্যাবধানে তার অধীনস্থ বিভিন্ন স্থান ও এলাকা পরিদর্শন করবেন
- উপজেলায় খাদ্য বিক্রেতা ও পরিবেশনকারীদের তালিকা তৈরী ও সংরক্ষণ এবং খাদ্যে ভেজাল মেশানো প্রতিরোধ করা। সময় সময় এই ধরনের খাবার দোকান পরিদর্শন করা
- উপজেলায় সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ও বিস্তার রোধকল্পে সকল হাট বাজার, কসাইখানা, মেলার স্থান, শিল্প প্রদর্শনী, ধর্মীয় জলসা প্রভৃতি স্থানের সার্বিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা
- উপজেলার সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রণয়ন ও সংরক্ষণ এবং সেই সব প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ আছে কি না তা পরিদর্শন করা। কোনো অনিয়ম লক্ষিত হলে খারাপ স্বাস্থ্য পরিবেশের ভয়াবহতা ও তা মোচনের জন্য তাদের ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন করা।
- উপজেলার সকল স্বাস্থ্য শিক্ষা সম্পর্কিত কার্যাবলীর জন্য দায়ী থাকিতে হবে
- উপজেলাবাসীদের ব্যবহারের জন্য পরিচ্ছন্ন এবং বিশুদ্ধ পানি প্রাপ্তি নিশ্চিত করার দায়িত্ব গ্রহন

- রিজার্ভ পুকুর ও কুয়োর পানি সংরক্ষণ করার দায়িত্ব গ্রহন এবং প্রয়োজনবোধে পানি বিশুদ্ধকরণের কাজ করা
- পানীয় জলের উৎপত্তিস্থল থেকে পানির নমুনা সংগ্রহ করা এবং সময় সময় জনস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে জীবানু সমন্ধীয় পরীক্ষার ব্যবস্থা করা এবং এই ধরণের কাজের যথাযথ রেকর্ড সংরক্ষণ করা। প্রতি ইউনিয়ন থেকে প্রতিমাসে কমপক্ষে একটা নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো
- যে কোন ধরণের মহামারী দেখা দিলে উপজেলায় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা কর্তৃক গঠিত সার্ভিলেন্স টিমের (পর্যবেক্ষণ দলের) নেতা হিসেবে কাজ করা। এই ধরণের মহামারি সংগঠিত হওয়ার রোগতত্ত্ব বিষয়ক তদন্ত করে প্রতিকার মূলক ব্যবস্থার প্রস্তাব পাশ করা
- উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার নির্দেশে সম্প্রসারিত টীকাদান কর্মসূচী সংগঠনে সহায়তা করা
- মাঠ পর্যায়ে ভ্রমণের সময় সকল জন্ম ও মৃত্যু প্রতিবেদন, তৈরীর ব্যাপারে উপজেলা চেয়ারম্যানকে পরামর্শ দান
- উপরস্থ কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত অন্য যে কোন কাজ সম্পাদন করা
- অধ:স্তন মাঠকর্মীদের কাজ তত্ত্বাবধান করা

পরিশিষ্ট-২: বিএসটিআই এর ফিল্ড অফিসারদের দায়-দায়িত্ব

ফিল্ড অফিসার (সিএম)

- বাধ্যতামূলক সিএম লাইসেন্সের আওতাভুক্ত পণ্যের গুনগত মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ইন্সটিটিউশন কর্তৃক আরোপিত শর্তাবলী অনুযায়ী মান চিহ্ন ব্যাবহার হচ্ছে কিনা এবং ইন্সটিটিউশন কর্তৃক নির্দেশিত টেস্টিং কর্মসূচী যথাযথভাবে সম্পাদিত হচ্ছে কিনা তাহা যাচাই করা
- বাজার পরিদর্শন করে সিএম লাইসেন্স বিহীন বাধ্যতামূলক পন্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা সংগ্রহ এবং তাদেরকে লাইসেন্স গ্রহনে উদ্বুদ্ধ করা এবং প্রয়োজনে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশসহ আইনানুগ ব্যাবস্থা গ্রহণের জন্য প্রস্তাব পেশ করা
- যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান সিএম লাইসেন্স গ্রহন/নবায়নের জন্য আবেদন করেছে সে সকল প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনপূর্বক নমুনা সংগ্রহ করে পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রস্তুত করা
- পরীক্ষিত নমুনার পরীবিক্ষণ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মান অনুযায়ী পর্যালোচনাপূর্বক উক্ত পণ্যের অনুকূলে লাইসেন্স প্রদান/নবায়ন/প্রত্যাখান সংক্রান্ত নথির কার্যক্রম গ্রহন ও উপস্থাপন
- পওন্যও জন্য প্রনীত বাংলাদেশ মানে কোন রকম অসংগতি পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট মানটি রিভিশনের জন্য প্রস্তাব করা।
- বিভিন্ন পণ্যের জন্য প্রনীত বাংলাদেশ মান এবং অন্তর্জাতিক মান সম্পর্কে ধারণা লাখ ও তদানুযায়ী কার্যক্রম তদারকি
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন

পরিশিষ্ট-৩ :বিএসটিআই এর আওতাভুক্ত ৫৮টি খাদ্যপণ্যের নাম

১. পাইনআপেল জুস
২. চিলিস, হোল এন্ড গ্রাউন্ড
৩. টারমারিক পাউডার
৪. বনস্পতি
৫. লাচ্ছা সেমাই
৬. পাস্তুরিত দুধ
৭. কোমল পানিয়
৮. হোয়েট ব্রান
৯. হোল মিল্ক এবং স্কিম মিল্ক পাউডার
১০. সাদা রুটি
১১. বিসকিট
১২. লজেন্স
১৩. প্যাকেট চা
১৪. ফ্রুট স্কোয়াস

১৫. জ্যাম, জেলি, এবং মারমালেড
১৬. ফ্রুট ভিনেগার (সিরকা)
১৭. বাটার
১৮. সয়াবিন তেল
১৯. ভ্যাকুয়াম প্যান সুগার
২০. আটা
২১. ময়দা
২২. ফ্রুট অথবা ভেজিটেবল জুস
২৩. কার্বোনেটেড বেভারেজ
২৪. ফ্রুট সিরাপ
২৫. হানি
২৬. লিকিউড গ্লুকোজ
২৭. ডেক্সট্রোজ মোনো হাড্রেট
২৮. টফিস
২৯. ক্যান্ড এন্ড বোটল ফ্রুট
৩০. ফ্রুট করডিয়াল
৩১. সস (ফ্রুট এনড ভেজিটেবল)
৩২. টমেটো জুস
৩৩. টমেটো পেস্ট
৩৪. পিকল
৩৫. কনসেনট্রেটেড ফ্রুট জুস
৩৬. টমেটো কেচআপ
৩৭. ক্যান্ডি পাইনেপল
৩৮. ইনফ্যান্ট ফরমুলা
৩৯. বাটার অয়েল এন্ড ঘি
৪০. মাস্টার্ড অয়েল
৪১. নুডলস
৪২. ইনস্টান্ট নুডলস
৪৩. লোডিড সল্ট
৪৪. পাম অয়েল
৪৫. খাবার পানি
৪৬. ন্যাচারাল মিনারেল ওয়াটার
৪৭. আইস ক্রিম
৪৮. চিপস/ক্রাকারস
৪৯. চানাচুর
৫০. কনডেন্সড মিল্ক
৫১. কোকোনাট অয়েল
৫২. পাম অলেইন
৫৩. এডিবেল সান ফ্লাওয়ার অয়েল
৫৪. সুজি (সেমোলিনা)
৫৫. কেক
৫৬. ইয়গহার্ট এন্ড সুইটেন্ড ইয়োগহার্ট
৫৭. কারি পাউডার
৫৮. রিফাইন্ড সুগার

পরিশিষ্ট-৪: পিওর ফুড রুলস ১৯৬৭ অনুযায়ী স্যানিটারি ইন্সপেক্টরকর্তৃক পরিদর্শিত ১০৭টি খাদ্য আইটেম এর তালিকা

Milk and Milk Product

1. Cow milk
2. Buffalo milk
3. Milk or mixed milk (cow and Buffalo)
4. Skimmed Milk
5. Condensed Milk, Full cream (sweetened)
6. Condensed Milk, Full cream (unsweetened)
7. Condensed Milk, Skimmed (sweetened)
8. Condensed Milk, Skimmed (unsweetened)
9. Sterilized Milk
10. desiccated Milk or dried Milk Powder
11. Dried Skimmed Milk or not Feet dried Milk or Skimmed Milk Powder
12. Cow Ghee
13. Buffalo Ghee
14. Mixed Ghee
15. Butter
16. Cream or malai
17. Mowa or Khowa

18. Sandesh, Khir, Rosogolla, Barfi, Para, Kalamand
19. Dali, or Curd (From Cow or Buffalo Milk)
20. Curd(from cow or buffalo)
21. Cheese
22. Skimmed Milk
23. Chana
24. Ice cream, Fruit ice cream, Malai Baraf and Kulfi Baraf
25. Toned Milk

Edible Oil and Oil Product

26. Mustard oil
27. Cotton seed oil
28. Grand neet oil
29. sesame oil
30. olive oil
31. Poppy seed oil
32. Coconut oil
33. Almond oil
34. soybean oil
35. Banaspati or Vanaspati or vegetable oil products(in any name)
36. Margarine
37. Tea
38. Coffee
39. Roasted Coffee
40. Ground Coffee
41. Refine Sugar
42. Desi Sugar
43. Gur (sugarcane)
44. Gur (Khejure)
45. Honey
46. Liquid Glucose
47. Batasa

Food Grains

48. Food Grains- Rice, Wheat, gram, Barly, oats, maize, jawer, Bajra
49. Atta
50. Wheat Flower or maida
51. Suji
52. Corn Flour
53. Basan, Vasan
54. Vermicelli or Shemai
55. Arrow root
56. Sago or Sagudana
57. Shoti or Shoti Food

Non-Alcoholic Beverages

58. Aerated Water
59. Soda Water
60. Haldi or Turmeric
61. Zeera/Cumin
62. Dhania or Coriander
63. Jwain
64. Chillies
65. Black Pepper

66. Fenugreek
67. Neetmeg
68. Mace
69. Cinnamon
70. Cloves
71. Cardamomom
72. Greater Cardmm
73. Aniseed
74. Saffron
75. Poppy Seed
76. Curry Powder
77. Garam Masla

Fruits, Vegetables and Miscellaneous Product

78. Tomato Juice
79. Fruit Juice
80. Fruit Syrup
81. Fruit Squash
82. Fruit Beverage
83. Sirka or venager
84. Tomato Sauce, Tomato Ketchup
85. Jam
86. Fruit Jelly
87. Marmalade
88. Bottled or Canned fruit
89. Bottled or canned Vegetable
90. Fruit Chutney
91. Dried or dehydrated Fruits
92. Fruits and Vegetable preserved or morobba
93. Pickles
94. Bottled or canned meat
95. Common salt
96. Baking powder
97. Khair or edible catechee
98. Edible gelatine
99. Edible Fats
100. Biscuits
101. Loaf, Brea(White)
102. Lozenges
103. Toffees
104. Chocolate
105. Dried fish (Unsalted)
106. Dried fish (salted)
107. Ice